কোরানের আলোকে পীর কে কি ও কেন

ডাঃ এ এন এম এ মোমিন

পীর শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে গৃহীত যার বাংলা অর্থ বুজুর্গ বা বয়স্ক ব্যক্তি। এই পদবীটি সুফিবাদের একজন মহান শিক্ষক বা আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এই শব্দটি হযরত অথবা শায়খ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। আরবী ভাষায় যাকে বয়োবৃদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। ইংরেজী ভাষায় পীর পদবীর সমর্থক হিসাবে SAINT বা সাধু-সন্ন্যাসী বলা হয়ে থাকে। সুফিবাদী মতাদর্শে একজন পীরের ভূমিকা হলো তার শিষ্য বা মুরীদের সুফি ত্বরীকার মত ও পথে পরিচালিত করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা। পীর শব্দের সমার্থক অন্য আরবী শব্দগুলা হলো মুর্শিদ, হাদী, ওলী, শিক্ষক, প্রভু, ইমাম, মান্যবর। আলীম অনুসারীরা চিন্তাধারায় পীরকে একজন সরাসরি হযরত আলী (আ.) এর বংশধরকে বুঝিয়ে থাকে।

হিন্দি পরিভাষায় পীর বাবা হিসাবে একজন সুফি সাধককে মান্য করা হয় এবং তার মৃত্যুর পর জনগণ তার কবর, মাকর্বারা, দরগাহ্ মাজার জিয়ারত করতে যায়।

সুফি বা আধ্যাত্মিক পথযাত্রা শুরু হয় একজন মুরিদের প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে। একজন পীরের হাতে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে সে আল্লাহ্র কাছে তার পূর্ববর্তী গোনাহ্ মাফের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যৎ গোনাহ্ না করার জন্য প্রতিশ্রতিবদ্ধ হয়। এখান থেকেই তার মুরিদ হিসাবে পরিচিতি শুরু হয়। অর্থাৎ সে আল্লাহ্র পথের একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষ তাই সে একজন পবিত্র পথের যাত্রী বিধায় সে এত সহজে পাপ কাজে লিপ্ত হবে না। একজন পীর কোন এক বা একাধিক ত্বরিকার শিক্ষা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ তিনি তার মুশির্দের নিকট থেকে খিলাফতপ্রাপ্ত হয়েই পীরের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।
এ আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আমাদের বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত 'পীর' শব্দটির মূল আরবী ভাষার সমার্থক শব্দ হলো ইমাম, ওলী, মর্শিদ, হাদী অনুরূপ। তাই এসব শব্দের সঠিক মতার্থ বা ব্যাখ্যা আমরা পবিত্র কোরআনে অনুসন্ধান করব।

পবিত্র কোরআনের বিষয় বস্তুতে আমরা পাঁচটি মূলতত্ত্ব জানতে পারি। কোরআনে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা, বৈশিষ্ট এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জীব জগতের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল্লাহ্ আছেন এবং তিনিই সবকিছু এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করছেন আর বিশ্বে সব কিছুই প্রতিনিয়তই তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যদি কোন ব্যক্তি মনে করে যে, সে স্বাধীন বা কারো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। সে ব্যক্তি তাহলে বুঝতে হবে সে বদ্ধ উম্মাদ। কারণ সে যে সর্বতোভাবে তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এ ব্যাপারে তার কোন চেতনাই নাই। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস, আহার-বিহার সব কিছুই সেই মহান স্রষ্টা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তাই পবিত্র কোরআনে পরম নিয়ন্ত্রা আল্লাহ্ ও তাঁর নিয়ন্ত্রিত জীবের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া প্রকৃতি, সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব বিকাশ অস্তিত্বের স্থিতিকাল এবং কর্ম পরিধি আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমাদের পবিত্র কোরআন থেকে আনতে হবে আল্লাহ্ কে? জীব বা সৃষ্টি কি? প্রকৃতি কি? ভৌতিক জাত কি? আর কিভাবে তা আল্লাহ্র দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবের কার্যকলাপই বা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

আমরা পবিত্র কোরআন থেকে জানতে পারি যে, আল্লাহ্ তালার কিছু নির্বাচিত বান্দা তাদেরকে আল্লাহ্ তালা বিশ্বশান্তির শ্বাসত ও বৈশিষ্ট পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেন। যিনি এসব কিছু জানেন না তিনি সাধারণ মানুষ তথা মুখে। আর মূর্খ ব্যাক্তিরা কখনও আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না।

পরম করুণাময় আল্লাহ্তালা হযরত ইব্রাহীম (আ:) কে এই ধরনের মর্মে বলা হয়েছে। এইভাবে আমি ইব্রাহীমকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই (প্রত্যক্ষ জ্ঞান দান করে) যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। (সূরা আলআম- ৭৫) অর্থাৎ নামাজ,রোজা হজ, যাকাত। কেহ নিশ্চিত বিশ্বাসী হয় না। বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করা হলেই একজন ব্যক্তি আল্লাহ্র বিবেচনায় নিশ্চিত বিশ্বাসী হতে পারেন।

স্মরণ রাখতে হবে যে, ইব্রাহীম (আ.) আল্লাহ্ নিয়োজিত ইমাম ছিলেন। এরশাদ হচ্ছে স্বরণ কর, যখন ইব্রাহীমকে তাহার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা (নির্দেশ) পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেই গুলি যে পুন করেছিল। আল্লাহ্ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা ইমাম, মান্যবর, প্রশাসক নেতা মালিক করতেছি সে বলল। আমার বংশধরদের মধ্যে হইতেও আল্লাহ্ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি বিশেষ দায়িত্ব/ক্ষমতা প্রদানের বিষয়টি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। (সূরা বাকারা:১২৪) অর্থাৎ কোন জালিম ব্যক্তি আল্লাহ্ তালার এই বিশেষ জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। আল্লাহ্ তালার এই অমোঘ বিধানের আওতায় আল্লাহ্তালার বিশেষ নির্বাচিত ব্যক্তিকে এই মহাজ্ঞান তথা নেয়ামত প্রদান করা হয়। তাই আমরা পবিত্র কোরআনে নবী-রাসূল ও অনুরুপ মহান ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দেওয়া হয়ে থাকে। এরশাদ হচ্ছে।

১. আমি অবশ্যই দাউদ ও সোলাইমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা উভয়েই বলিয়াছিল সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি আমাদিগকে তাহার বন্ধু মুমেন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। সোলায়মান হইয়াছিল দাউদের উত্তরাধীকারী এবং সে বলিয়াছিল হে মানুষ! আমাকে বিংশকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল কিছু (নবুওতী জ্ঞান ও রাজ্য পরিচালনার জ্ঞান ও শক্তি) দেওয়া হইয়াছে। ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ । (সুরা নমল : ১৫ – ১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত এই বিশেষ জ্ঞান ও শক্তি প্রাপ্তির পর এই ধরনের বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ অন্যান্য সাধারণ মানুষ তথা আমানু পর্যায়ের মানুষের নিকট থেকে আনুগত্য দাবি করার যোগ্যতা অর্জন করেন।

২. তিনি বললেন হে মুসা! আমি তোমাকে এরশাদ হচ্ছে বাণী (বক্তৃতা বিশেষ জ্ঞান) দিয়ে ও তোমার সাথে কথা বলে মানুষের তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছি সুতরাং আমি যা দিলাম প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ ও প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা সুতরাং এগুলো শক্ত করে ধর আর ওদের মধ্যে যা ভাল তা তোমার সম্প্রদায়কে গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও (সুরা আরাত: ১৪৪-১৪৫)।
৩. হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে: এবং তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল এবং তাকে বনী ইসরাইলের জন্য রাসূল করবেন। সে বলবে আমিতোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতেতোমাদের নিকট নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য কর্জম দ্বারা একটি পক্ষী সদৃশ আকৃতি গঠন করব। অতঃপর এতে আমি ফুৎকার দিব কলে আল্লাহ্র হুকুমে পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যক্তিগ্রস্তকে নিরাময় করব এবং আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করব। তোমরা আমাকে গৃহে যা আহার কর ও মজুদ কর তা তোমাদিগকে (গায়েবের জ্ঞান) বলে দিব (সুরা আলে ইমরান: ৪৮-৪৯)।

৪. হযরত খিজির (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে: "অতঃপর এটা সাক্ষাৎ পাইল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের যাকে আমি আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান (ইলমে লদুন্নী), (সূরা কাহাফ: ৬৫)। হযরত লোকমান (আ.) সম্পর্কে এরশাদ হচ্ছে : আমি লোকমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌র প্রকিতকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (সুরা লোকমান : ১২)

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত পাঁচটি আয়াত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ এই বিশেষ জ্ঞান হযরত ইবরাহীম, হযরত মুসা ও হযরত ঈসার (আ.) মত সর্বশ্রেষ্ঠ নবীদের দেওয়া হয়েছে। আবার হযরত খিজির (আ.) ও হযরত লোকমান (আ.)কে দেওয়া হয়েছে। যদিও এদেরকে নবীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। অথবা পবিত্র কোরআনেও এদেরকে নবী বা রাসুল হিসাবে উল্লেখ করা হয় নাই। যা হোক, একটি ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সব মহান আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে এ ধরনের বিশেষ জ্ঞান ও শক্তি দানন করা হয় ও তাদেরকে বিশেষ ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই পবিত্র কোরআনে নবী-রাসুলদের সুনির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব (God Description) লিখিতভাবে রয়েছে। কোরআন মতে নবী রাসূলদের দায়-দায়িত্ব :

আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন। যে তারা আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলওয়াত করে, তাহাদিগকে পরিশোধন করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল (সুরা আলে ইমরান-১৬৪)।

নবী-রাসুলগণ এ ধরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহান ব্যক্তিবর্গ হলো আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Permanent Cadre Officers)। এ কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়। এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে "স্মরণ করো, আল্লাহ্ যখন পয়গম্বরদের নিকট থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন আজ আমি মোতাদিগকে কিতাব ও হিকমত দান করেছি। যদি অন্যকোন রাসুল তোমাদের কাছে আসেন তাহলে তার উপর ঈমান আনতে হবে এবং তাকে সাহায্য করতে হবে। একথা বলে আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেন- তোমরা কি এর অঙ্গীকার করো এবং এ ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে অঙ্গীকারের গুরু দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত আছ? তারা জবাবে বললেন, হ্যাঁ আসবো অঙ্গীকার করছি এই শর্ত প্রত্যেক পয়গম্বর (নির্বাচিত/ মনোনিত/ প্রশাসনিক/ উলিল আমর) দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের থেকে এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ করা হয়েছে। আপনাদেরকে যে দ্বীনের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারই প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অন্য কোন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে পাঠানো হয় তার প্রতি কোন হিংসা, বিদ্বেষ পোষন করা যাবে না। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআন: আর হে নবী মনে রেখ সেই অঙ্গীকারের কথা যা আমি সকল পয়গম্বরের কাছ থেকে নিয়েছি। তোমার কাছ থেকেও। নূহ, ইবরাহীম, সুনা ও মরিয়ম পুত্র ঈসার ক থেকে, সবার কাছ থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি (সূরা আহযাব: ৭)। আর স্মরণ করো যখন আল্লাহ্ তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়ে ছিলেন যাদের উপর তার কিতাব নাযিল করা হয়েছিল। এ মর্মে তোমরা এর শিক্ষা বর্ণনা করবে এবং একে গোপন করবে না (সুরা আলে ইমরান : ১৮৭)।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ এবং পবিত্র কোরআনে অনুরুপ আয়াত সমূহ পর্যালোচনা করে দেখা ও জানা যায় যে, আমাদের দুনিয়াবী রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনায় ব্যয় পাবে রাষ্ট্রপতি/ মন্ত্রী/ জাতীয় পরিষদের সদস্যসহ অন্যান্য দায়িত্ব শীল কর্মকর্তা যেমন নিজ-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শপথনামা (Oath of Allegiances) পাঠ করে থাকেন যে, পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়েদায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি রাগ, অনুরাগ, বিরাগ, মান অভিমানের উর্ধ্বে থেকে ন্যায়-নীতি ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রতিপালন করবেন মর্মে

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নবী, রাসুল ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের অনুসরণে মানবীয় সরকার ব্যবস্থায়ও এ ধরনের প্রশাসনিক অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতির বিধান চাল করা হয়েছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনায় আল্লাহ্‌তালা যে একটি বিশাল কর্মীবাহিনীর মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করে থাকেন তা সহজেই বুঝা যায়। আরো উল্লেখ্য আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিয়োজিত এই সকল কর্মকর্তাগণ যদি আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশ প্রতি পালন না করেন অথবা আল্লাহ্‌র আইন ভঙ্গ করে কোন কাজ করেন তাহলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাকে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে: সে (নবী রাসুল-উলিল আমর, ওলী/ ইমাম হাদী/ মুর্শিদ/ মোমিন কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা) যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করে চালাতে চেষ্টা করে আমি অবশ্যই তার দলিল হস্ত কেটে ফেলতাম এবং কেটে ফেলতাম তার জীবন ধমনী, অতপর তোমাদের মধ্যে এমন কেহই না যে, তাকে রক্ষা করতে পারে।

আল্লাহ্‌র প্রশাসগণ ব্যবস্থা বুঝার জন্য পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত বর্ণনা করা হচ্ছেঃ

১. আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি ও তার অন্তরের নিভৃত কুচিন্তা আমার জানা আছে। আমি তার ঘাড়ের ধমনীয় চেয়ে কাছের। স্মরণ রেখ, দুটো ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ কর্ম লিখে রাখে, মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিখে রাখার জন্য তৎপর প্রহরী তাদের কাছেই রয়েছে (সুরা কাফ: ১৬-১৮)।

২. আল্লাহ্‌ ও যাদের কাছে কিতাবে জ্ঞান আছে তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট (সুরা রাজ : ৪৩)।

৩. তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব। আর তোমাকেও তাদের সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করব (সুরা নিসা : ৪১)।

৪. মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে, যারা আল্লাহ্‌র আদর্শে তার রক্ষণা বেক্ষণ করে (সূরা বাদ : ১১)।

৫. ...তুমি তো কেবল সতর্ক কারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক (সুরা বাদ : ৭)

৬. স্মরণ কর, সেই দিনকে যখন আমি প্রত্যেক সম্পদায়কে উহাদের নেতাসহ ইমাম আহ্বান করব। যারাদের দক্ষিণ হস্তে হাদের আমলনামা দেওয়া াহবে (সুরা বনি ইসরাইল : ৭১)

৭. আল্লাহ্‌র পথে যারা নিহত হয় তাহাদিগকে মৃত বলনা, বরং তারা জীবিত, কিন্দু তোমরা উপলব্ধি করতে পারনা (সুরা বাকারা : ১৫৪)।

৮. যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাহাদিগকে কখনই মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। "(সূরা আল ইমরান-১৬৯)। এ ধরনের **মহান** ব্যক্তিদের কবরকে লোকে মাজার শরীফ হিসাবে জিয়ারত ও মানত করে।

৯. জানিয়া রাখ আল্লাহ্‌র বন্ধুদের (ওলা আল্লাহ্‌) কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত ও হবে না। যারা ইমান জানে ও তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে। আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এটাই মহাসাফল্য। সূরা ইউলুম:৬২-৬৪)।

১০.আল্লাহ্‌ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না , তুমি কখনও তাহার কোন পথ প্রদর্শনকারী অভিভাবক (ওযালিয়াম মুর্শেদা) পাইবেনা। সূরা কাহফ:১৭) বর্ণিত আয়াত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দাদের কাজ-কর্মের দেখাশুনা, তাদের নিরাপত্তা, তাদের নেতৃত্ব প্রদান, তাদের হেদায়েত করা, তাদের নিকট পবিত্র কোরআন, তেলায়ত, বিশ্ব পরিচালনা বিষয়ক জ্ঞান

শিক্ষা, আল্লাহ্‌র বান্দাদের আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করার জ্ঞান ও শক্তি সম্পন্ন মহান ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। এ কারণেই আল্লাহ্‌র কর্তৃক নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মান্য করাও নবীদের মত ফরজ বা অবশ্য পালনীয়। আর এই নায়েবে নবী, ওয়ারীস-এ-রাসুল, খলিফা এ-রাসুল, আল্লাহ্‌ নিয়োজিত মানবজাতির জন্য ইমাম, হাদি রয়েছেন তাদের অনুসন্ধান করা বা জানা তাদের চিন্তা ও মান্য করা তথা সম্মান করা সম্পর্কে যারা খারাপ ধারনা পোষণ করে তারাই প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌ ও তার রাসুলের প্রকাশ্য দুশমন, তথা শয়তানের সেবা দান যে বা যারা আল্লাহ্‌র এসব মহান বান্দাদের থেকে লোকজনকে দূরে রাখার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। যেহেতু এই সব মহান ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্‌ কর্তৃক সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত তাই এদের প্রতি যথাযথ সম্মান করা বা মান্য করা বা আনুগত্য প্রকাশ করা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা:

১. আল্লাহ্‌র এ নিয়ম নয় যে, তিনি সরাসরি অদৃশ্য (গায়েব) সংক্রান্ত জ্ঞান (সবাইকে) দান করবেন, বরং এ কাজের জন্য তিনি তার রাসুলের অনুরূপ (নিয়োগপ্রাপ্ত) মধ্য থেকে যাকে খুশি নির্বাচন করেন। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌ ও রাসুলের উপর ঈমান আর (সূরা আলে ইমরান : ১৭১)।
২. আমি যে রাসুলই পাঠিয়েছি তা এ জন্য যে আল্লাহ্‌র নির্দেশেই তার আনুগত্য করা (সুরা নিসা : ৬৪)।
৩. যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করলো।
৪. হে মোহাম্মদ তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্‌ কে ভালবাস তাহলে আমার কথা মত চলো তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাদের ভালবাসবেন (সুরা আলে ইমরান : ৩১)।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এমন আল্লাহ্‌র বান্দাদের হিকমত প্রদানের পর বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অর্পণ করা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ বলেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয় এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু শিক্ষা গ্রহণ করে (সুরা বাকারা : ২৬৯)।
আর যাকে এই হিকমত প্রদান করা হয় এবং যাদের এই হিকমত জ্ঞান নাই এই দুই গ্রুপের পার্থক্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে: দল দুইটির উপমা অন্ধ ও বাধরের এবং চক্ষুস্মান ও শ্রবণশক্তির সম্পন্নের ন্যায় তুলনায় এই দুইকে সমান ? তবু ও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না। (সূরা হুদ: ২৪)।
এই প্রসঙ্গে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোরআনিক শুদ্ধিকরণ করা অতি জরুরী। বিষয়টি হচ্ছে আলেম বা মাদ্রাসা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্ত জ্ঞানী বনাম আল্লাহ্‌ প্রদত্ত হিকমত তথা কোরআন হাদীসের সার্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে।
বর্তমানে সমাজে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যারা আরবী ভাষায় পারদর্শী বিশেষ করে মক্কা,মদিনা আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ইসলামী জ্ঞান কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রিপ্রাপ্ত হন তারাই ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ এবং পবিত্র কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে তাদের কথাই সর্বত্রমান্য। এ ব্যাপারে কোরআনের মন্তব্যে ঘোষণা: কুফরী ও মোনাফেকীতে আরব বাসীগণ অত্যন্ত কঠোর এবং আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলের সীমারেখা (সম্পর্কিত জ্ঞান) সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা তাদের অধিক। (সূরা তাওবা: ৯৭) । আবার আরববাসীরা বাসূলের সমসাময়িক সবাই যে উচ্চস্তরের জ্ঞানী বা খোদাভীরু পরহেজগার বা ঈমানদার ছিলেন না, এ ব্যাপারে কোরআনের সুফি আরববাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের (রাসূল (সাঃ.) এর) আশেপাশে আছে তারা কেহ কেহ মুনাফিক এবং মদিনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ মুনাফেকীতে সিদ্ধ। তুমি তাদেরকে জাননা (রাসূল

(সা.) ও ওফাতের পর তাদের স্বরুপ অবপত হওয়া যায়)। আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দুইবার শাস্তি দিয়ে ও পরে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে। (সূরা তাওবা:১০১)। কোরআন ব্যাখ্যা একটি বিশেষায়িত দায়িত্ব তাই যে কোন ব্যক্তি এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় বিধায় সবার ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা:

তাড়াতাড়ি ওহী কোরআন আয়াত কারবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা সঞ্চালন কারো না। ইহা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমরাই। সুতরাং যখন আমি এটি পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর এর বিশাদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমরাই।"(সূরা কিয়ামা ১৬-১৯ যেহেতু পবিত্র কোরআন একটি শাসনতান্ত্রিক দলিল তাই এই মহান কিতাবের সরকারী ব্যাখ্যাদাতা তৎপরবর্তী যুগে আল্লাহ্ প্রদত্ত হিকমত ও বিশেষ জ্ঞানের অধিকারীরাই কোরআন ব্যাখ্যার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ। এ কারণে আমরা পবিত্র কোরআনে আরবী ভাষার পন্ডিতদেরকে নয় বরং বিশ্ব পরিচালনার জন্য অপরিহার্য জ্ঞান হিসেবে আল্লাহ্র নির্দেশনাবলীর উদ্ভাবন কে জ্ঞানী, চিন্তাশীল, বোধশক্তিসম্পন্ন শ্রবণকারী ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হচ্ছে :

১.আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদিগকে যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা প্রেম ও দয়া সৃষ্টি করেছে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তাতে অবশ্যই বহু নির্দেশনা রয়েছে
(সূরা রুমঃ ২১)।

২.আর তাঁর নির্দেশনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা (পৃথিবীর বিভিন্ন মানব সম্পদায়সহ অন্যান্য প্রাণীদের ভাষা রহস্য) ও বর্ণের বৈচিত্র (বাঘ, সর্প ও অন্যান্য প্রাণীর রং এর বৈচিত্রের সৌন্দর্য ও রজন্যের অন্তর্নিহিত কারণ গবেষণা) এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে (সুরা রুম : ২২)।

৩. আর তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদিগকে প্রদর্শন করেন, বিদ্যুৎ, ভয়, ভরসা, সঞ্চারকরুপে এবং আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন ও তদ্বারা ভূমিকে পুনজ্জীবিত করেন ইহার মৃত্যুর পর হতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য (সুরা রুম : ২৪)।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে জানা গেল আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্যের সাথে প্রকৃত জ্ঞানীদের কোন সম্পর্ক নাই। বরং দুনিয়াবী জ্ঞানীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণী বা বিভাগ রয়েছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদিস বর্ণনা করা হচ্ছে :

১. আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকট সৃষ্টি জীবের মধ্যে অন্যতম ঘৃণ্য শ্রেণী হলো এমন কারীরা (জ্ঞানীরা) যারা আমিরদের সাথে সাক্ষাৎ করে (সুনান্যুত তিরমিযি : ২৩৮৩ সুনানু ইবনে মাজাহ্ : ২৫৬)।

২. উমর ইবনু খাত্তাব (রা.) বলেন, "রাসুল (সা.) আমার কাছে আসলেন, আমি তার চেহারায় ক্রোধের ছাপ দেখতে পেলাম। তিনি তার দাড়িতে হাত রেখে বলরেন, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা তার কাছেই ফিরে যাব। আমার কাছে জিবরাইল (আ.) এসে বললেন, আপনার পরে অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আপনার উম্মাহ্ ফিতনায় নিপতিত হবে। আমি বললাম, এই ফিতনার সূত্রপাত কিসের থেকে হবে। তিনি বললেন, তাদের আলিম এবং শাসকদের তরফ থেকে হবে।

শাসকরা মানুষদের তাদের প্রাপ্য হক থেকে বঞ্চিত করবে, জনসাধারণকে তাদের হক প্রদান করবে না আর আলেমরা তাদের শাসকদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করবে। আমি বললাম, হে জিবরাইল (আ.) তাদের মধ্যে যারা নিরাপদে থাকবে তারা কোন জিনিষের দ্বারা নিরাপদে থাকবে? তিনি বললেন, বিরত থাকার

মাধ্যমে এবং সবরের মাধ্যমে তাদের যদি তাদের প্রাপ্য হক প্রদান করা হয়, তাহলে তারা তা গ্রহণ করে নেয়। আর যদি তাদের বঞ্চিত করা হয় তাহলে তারা তা ছেড়ে দেয় (ইবনু কাসিব : ২/৬৫৯)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)থেকে বর্ণিত হয়েছে, অচিরেই মানবজাতির উপর এমন এককালের আবির্ভাব ঘটবে যখন ইসলামের কিছুই বাকী থাকবেনা-শুধু তার নাম ছাড়া কোরআনের কিছু বাকি থাকবে না-শুধু তার নক্শা ছাড়া, তাদের মসজিদগুলো হবে জীবন্ত; কিন্তু তা হবে একেবারে হেদায়েত শূন্য। তাদের আলিমরা হবে আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণী, তাদের থেকেই ফিত্নার উদ্ভব ঘটবে আর তাদের মধ্যেই ফিত্নার প্রত্যাবর্তন হবে (আল কামিল, ইবনু আদি : ৪/২২৭)।

উমর (রা.) বলেন, তুমি কি জানো, কোন জিনিষ ইসলামকে ধংস করে? ইসলামকে ধ্বংস করে আলিমদের বিচ্যুতি আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের বিবাদ এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের ফায়সালা (সুনানুদ দাবিমি : ২২৫)। (তথ্যসূত্র : ইমাম জালালুদ্দিন সুয়তি (রা.) রাজ দরবারে আলিমদের গমন একটি সতর্কবার্তা আলী হাসান উমামা অনুদি, ডিসেম্বর ২০১৭)।

এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের আলেমদের শিক্ষা ব্যবস্থাও তার ফলাফল সম্পর্কে গবেষকদের পর্যবেক্ষণ: ইতোমধ্যে আমরা বর্ণিত হ্যাদিসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি রাসুল (সা.) ওফাতের পর ইসলাম ধর্ম এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ইসলামের দুশমন, রাসুলের দুশমন, রাসুলের বংশধর তথা কোরআন মতে যাদের ভালবাসা ফরজ তাদের শত্রুরা ক্ষমতাসীন হয়। ফলে তারা পবিত্র কোরআনের তথা রাসুল (সা.) এর মূল শিক্ষা অর্থাৎ ন্যায় ও সত্য প্রকাশ, প্রচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করল তখন দুনিয়ার অর্ধেক সম্পদ তাদের পায়ের নীচে। এই বিপুল সম্পদরাশি হাতে পেয়ে জাতির অযোগ্য উত্তরাধিকারী শাসক গোষ্ঠী ভোগ বিলাসে মত্ত হলো। এটা সমস্ত মুসলিম বিশ্বে নীতি আদর্শের পরিবর্তে সামাজিকভাবে এটা গৃহীত হলো আমীর বলতে ধনকুবের ও ফকির বলতে গরীব বুঝতে হবে। জাতির নেতারা জাতির সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করল। পৃথিবীর অন্যান্য রাজা-বাদশাহ্দের মতই তারা সকল প্রকার পাপাচারের লিপ্ত হয়ে গেল। কিন্তু বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী যেন খলিফা তথা আমীরুল মোমেনীন বা সুলতানদের বিরুদ্ধে না চলে যায় সে জন্য সুলতানদের প্রয়োজন হয় কিছু ভাড়াটিয়া আলেমদের যারা পদ ও সম্পদে লোভে শাসকদের যাবতীয় অনাচারকে কোরআন ও সুন্নাহ্র মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে এবং জনগণকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভুল, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তি শিখাবে। রাজা-বাদশাহ্রা যা কিছুই বলবে বা করবে কোরআন ও হাদিসকে অপব্যাখ্যা করে সেটাকে ইসলাম সম্মত করার চেষ্টা। এটা করার সুবিধার্থে প্রথমেই একটি ভাল হাসিদ রচনা করা হলো যার অর্থ হলো সুলতান বা রাজা-বাদশাহ্রা হলেন আল্লাহ্র ছায়া। তাই তারা যা করেন তাই ন্যায়, সত্য, যথাযথ, সঠিক। এ কারণেই রাজা বাদশাহ্র কোন কথা বা কাজকে চ্যালেঞ্জ করার অর্থ হলো আল্লাহ্কে চ্যালেঞ্জ করা। আর এটা হলো কুফরী। এ কারণে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আর এতবড় ভয়বহ ধর্মীয় অপরাধের সবচেয়ে ছোট শাস্তিই হলো মৃত্যুদণ্ড। এরই ধারাবাহিকতায় এই জাতির মধ্যে একদল অর্থলোভী আলেম, বুদ্ধিজীবীর জন্ম হলো। উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য এরা লক্ষ লক্ষ হাদিস জাল করলো। এই গোষ্ঠীটিকে সঠিক ইসলামের ব্যাখ্যাকারী ঐতিহাসিকগণ আলিমুস সুলতান, বা সরকারি আলেম, দরবারী আলেম, দুনিয়ার আলেম, ওলামায়ে দুনিয়া নিকৃষ্ট আলেম ইত্যাদি অপমানজনক নামে আখ্যায়িত করেছেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭) বাহশাহ্ মনসুরের (৭৫৪খৃ. ৭৭৫) এ ধরনের দরবারী আলেম হতে চান নাই বলে খলিফা মনসুরের জেলে শাহাদত বরণ করেন। যেহেতু এই জালেমশাহী তাদের মূল দায়িত্ব বহন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলল। ফলে সুরা তাওবার ৩৯ নম্বর আয়াতের মর্মানুযায়ী খোদায়ী গজব শুরু হলো। অর্থাৎ মুসলমান জাতিকে ইউরোপীয় অমুসলিমদের দাস জাতি বানিয়ে দিলেন।

ফলে আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের জীবন ব্যবস্থা থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ঢুকে গেলাম এব সেখানেই বসে বসে ধর্মচর্চা চালিয়ে যেতে লাগলাম। ব্যক্তিগত ধর্ম চর্চায় কে কত নিখুঁত তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলল। ফলে পোশাকে আশাকে মুসলমানরা কে কত বিশুদ্ধ সেটাই এখন কামেল উত্তম মুসলমান হওয়ার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হতে লাগল। এদিকে মাথার উপর যে ইউরোপীয় প্রভুদের বানানো দ্বীন /ধর্ম/রাজনীতি/সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি চালু হলো অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, বিচার ব্যবস্থা বা সার্বিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা তাদের কোন চেতনাই নাই। এই শ্রেণীর লোকেরা ধরে নিলেন ব্রিটিশ রাজত্বের মাধ্যমে তাদের দ্বীনি ব্যবস্থার কোন ক্ষতি হয় নাই্ কারণ যেহেতু তারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন তাই তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চ শ্রেণীর ঈমানদার হলো গেছেন। তাছাড়া শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ যাকাত আদায় করাই ভাল মুসলমান হওয়ার প্রধান শর্ত আর তাই বেহেশ্ত তাদের জন্যই নির্ধারিত।

ইউরোপের খৃস্টান জাতিগুলো সামরিক শক্তি বলে পৃথিবীর প্রায় সবকটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ অধিকার করার পর ভবিষ্যতে যাতে মুসলমানরা তাদের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেল। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করল (১) একটি সাধারণ ধর্ম নিরপেক্ষ (Secular Education System) (২) আরেকটি মাদ্রাসা শিক্ষা (Islamic Education)। এ দুটো শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আদর্শ ও চেতনার মৌলিক বৈপরীত্য রয়েছে। এই প্রক্রিয়াই তারা আমাদর বাস্তবেও মানসিকভাবে দুই মেরুর মানুষ তৈরী করে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদী অমুসলিমশক্তিগুলো তাদের অধিকৃত মুসলিম দেশগুলোতে মাদ্রাসা স্থাপন করল। উদ্দেশ্য-পদানত মুসলিম জাতিকে এমন ইসলাম শিক্ষা দেওয়া যাতে তাদের চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই একটা পরাধীন জাতির চরিত্রে পরিণত হয় তারা কোনদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুরে দাঁড়াবার চিন্তাও না করে। এ অঞ্চলের মানুষদের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মানসিকতা বিশ্লেষণ করে তাদেরকে মানসিক দাস বানিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ শ্রেণীর সহায়তায় খৃস্টান বা মাদ্রাসায় শিক্ষা দেবার জন্য তাদের মন মত Syllabus (পাঠক্রম) ও Curriculum (পাঠ দান পদ্ধতি) তৈরি করল। তাদের তৈরি সেই ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষাকে জাতির মন মগজে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য বড়লাট ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সালে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলিকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল।

এই মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল তা আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব ইয়াকুব শরিফ আলিয়া মাদ্রাসার ইতিহাস বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, "মুসলমানেরা ছিল বীরের জাতি, ইংরেজ বেনিয়ারা ছলে বলে কৌশলে তাদের কাছ থেকে দক্ষতা কেড়ে নিয়ে তাদের প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা ও মর্যাদা হরণ করার জন্য পদে পদে যে সব ষড়যন্ত্র আরোপ করেছিল আলিয়া মাদ্রাসা তারই একটি ফসল। বাহ্যত এই প্রতিষ্ঠানের পত্তন করা হয়েছিল আলাদা জাতি হিসাবে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত। যাতে মুসলমানদের ধর্ম, কৃষ্টি ও আদর্শ রক্ষা পায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধোকা দেওয়াটাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। এই যে ধোকাটা দিল কি সে ধোকা। এই মারটা কোথায় ও কিভাবে ছিল আল্লাহ্তালা প্রদত্ত হিকমত জ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া তা সঠিকভাবে কেউ বুঝতে পারে নাই।

(১) খৃস্টান পণ্ডিত/গবেষকগণ যে বিকৃত ইসলাম তৈরি করেছিল সেখান থেকে ইসলাম ধর্মের প্রাণ-ইলাহা-তৌহিদ তথা আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ববাদ দেওয়া হলো্ লা-ইলাহা ইল্লাহ্ এর অর্থ বলে দিল আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। মূল অর্থ হলো আল্লাহ্ ছাড়া কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌম ক্ষমতা তথা নির্দেশ বা হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা নাই। ইংরেজ পণ্ডিতগণ বললেন, উপাস্য নাই অর্থাৎ নামাযের সেজদা ছাড়া অন্যকোন

কর্মকাণ্ডে আল্লাহর্, কোন ভূমিকাই নাই। অনুরুপভাবে সৎকাজে আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ মুসলমানের কোনআনিক দায়িত্ব তা থেকে মুসলমানরা অব্যাহতি পেয়ে গেল। অর্থাৎ সমাজে নির্বিকারভাবে অসৎ অশ্লীল, ঘুষ, দুর্নীতি চলতে থাকবে, মুসলমান জনগণ চুপচাপ তা সহ্য করবে কোন রকম বাধা বা প্রতিবাদ করতে পারবে না।

(২) ব্রিটিশ শাসকরা মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রমে রাসুল (সা.) ওফাতের পরে যেসব বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করে আন্তকলহ গোত্র-বিরোধ, গৃহযুদ্ধ মুসলিমে মুসলিম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাছাড়া বিভিন্ন মাযহাবী ফিরকা ও এদের মধ্যে অন্তবিরোধ ইত্যাদি বাদ দিয়ে শিখানো হলো ওজিফা বা ব্যক্তিগত মাসলা-মাসায়েল ইত্যাদি।

(৩) খৃস্টানদের বানানো ইসলাম ধর্মে কার্যত কোরআনকে বাদ দিয়ে হাদিসের প্রবল প্রাধান্য দেওয়া হলো। কারণ বহু হাদিস মানুষ তার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তৈরি করেছে। খেলাফতের পর রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর উমাইয়া আব্বাসীয়া ফাতেমী, উসমানীয়া ইত্যাদি খেলাফতের নামে আমলে রাজতন্ত্রের রাজারা তাদের যার যার সিংহাসন রক্ষার জন্য অজস্র মিথ্যা হাদিস তৈরি করে আল্লাহ্র রাসুলের নামে চালিয়েছে সুন্নীরা তাদের মতবাদের পক্ষে শিয়ারা তাদের মতবাদের পক্ষে মিথ্যা হাদিস তৈরি করে নিয়েছে যার যার মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য। আরও বিভিন্নভাবে হাদিস বিকৃত করা হয়েছে। ইমাম বোখারী যার সংকলিত হাদিস সুন্নীরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দাবি করেন, তিনি সাড়ে ছয় লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করেছেন। যাচাই বাছাইয়ের পর তিনি তা থেকে মাত্র ৫ হাজার হাদিসকে সহিহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বাকী ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার হাদিস জাল বা বানোয়াট হিসাবে গণ্য। অন্যান্য ইমামের ক্ষেত্রেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

(৪) ব্রিটিশদের প্রণীত এই শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন কর্মমুখী (Vocational) শিক্ষা দেওয়া হলো না। অর্থাৎ অংক, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন ভূগোল, ইতিহাসে রাখা হলো না। ফলে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ জনসাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে জানার জন্য, ফতোয়া নেয়ার জন্য স্বভাবতই এদের কাছেই যেতে বাধ্য এবং তারা অব্যশ্নই ব্রিটিশ খৃস্টানদের প্রণীত ঐ প্রাণহীন, আত্মাহীন, তাওহীদহীন বিতর্ক সর্বস্ব ইসলামটাই তাদের শিক্ষা দেবে এবং এভাবেই ঐ বিকৃত ইসলামই সর্বত্র গৃহীত হবে, চালু হবে। খৃস্টানরা তাদের এই নীতি বাস্তবায়নে ১০০% সফলতা অর্জন করেছে। খৃস্টানদের গোলাম বা দাস হওয়ার পূর্বে আল্লাহ রাসুলের ইসলাম যথেষ্ট বিকৃত হয়েছিল তা না হলে তো খোদায়ী গজবের শিকার হতে হতো না। কিন্তু বিকৃত ইসলামের মধ্যে কিছুটা হলেও প্রাণ শক্তি ছিল। খৃস্টানদের তৈরিকৃত এই ইসলাম তাও শেষ হয়ে গেল এবং এটার শুধু কংকাল ছাড়া আর কিছুই রইল না। এরই ধারাবাহিকতায় আজও অসংখ্য মাদ্রাসা থেকে কোরআনের হাদিসের জ্ঞান নিয়ে লক্ষ লক্ষ আলেম বেরিয়ে আসছেন কিন্তু তাদেরকে জাতির ঐক্য গঠনের, ব্রত, জীবন সম্পদ উৎসর্গ করে সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রেরণা সমাজ বিরাজমান অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়নি। এই ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের পরিনামে তাদের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের অহংকার যেমন সৃষ্টি হলো, পাশাপাশি তাদের হৃদয়ে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের গতিশীল ভূবন থেকে পেছনে থাকায় এক প্রকার হীনমন্যতা সৃষ্টি হলো। তাদের অন্তমুখীতা। ছোটখাট বিষয় নিয়ে গোঁড়ামি, বিভক্তি, নিস্পৃহতা, স্বার্থ পরতা ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষের কারণ এই শিক্ষা ব্যবস্থার গোঁড়াতেই গ্রথিত রয়েছে। এ কারণে আমাদের জাতির মধ্যে লক্ষ লক্ষ আলেম রয়েছে কিন্তু জাতীয়ভাবে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী কোন সংস্কার, সংশোধন বিধান কার্যকর করার কোন ইচ্ছা আগ্রাহ প্রচেষ্টা কিছুই নাই। বরং ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মানবতা বিরোধী অপরাধে অপরাধী পাকিস্তানী বাহিনী কর্মকাণ্ড অনেক আলেম শরিয়তী দৃষ্টিতে জায়েজ ঘোষণা করেছিলেন। এখন এই আলেমদের অনেকে মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা, একুশে ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে শিরক বিদআত বা শরিয়ত বিরোধী আখ্যা দিয়ে নিজেরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন এবং অন্যদের বিভ্রান্ত করছেন।

আল্লাহ্ নির্বাচিত/মনোনীত ব্যক্তিদের গোনাহ্ মাফ ও সাদকা গ্রহণের মাধ্যমে দেয়ায় প্রাপ্তি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন:

১। "রাসুল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তার আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতিজুলুম করে তখন তারা তোমার নিকট আসলেও আল্লাহ্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে এবং রাসুল ও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলে তারা অবশ্যই আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল ও দয়ালুরূপে পাইবে (সুরা নিসা : ৬৪)।

২। "তোমাদের সম্পদ হতে সাদাকা গ্রহণ করবে। ইহার দ্বারা তুমি উহাদিগকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। তুমি এটাকে দু'আ করবে। তোমরা দু'আ তো এদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সুরা তাওবা : ১০৩)

"আল্লাহ্ ও রাসুলের (মনোনীত/নির্বাচিত ব্যক্তি বর্গের) মধ্যে পার্থক্যবারীরা পুরোপুরি কাফের ও বায়াতের দলিল সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা

১. তোমরা তাদেরকে হত্যা কর নাই। আল্লাহ্ তাদেরকে হত্যা করেছেন এবং তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ কর নাই আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন এবং এটা মোমেনগণকে আল্লাহ্র পক্ষ হতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ (সুরা আনফাল : ৭)।

২. যারা তোমার হাতে বায়াত করে তারা তো আল্লাহ্র হাতের উপর। অতঃপর যে এটা ভঙ্গ করে, এটা ভঙ্গ করার পরিনাম তারই এবং যে আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অব্যশই তাকে মহাপুরস্কার দেন (সুরা ফাতাহ্ : ১০)।

৩. যারা আল্লাহ্ ও তাদের রাসুলগণে ঈমান আনে এবং তাদের একের সাথে অপরের পার্থক্য করেনা তাদেরকে তিনি অবশ্যই পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা নিসা : ১৫২)।

৪. যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে ও তার রাসুলদিগকে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করতে চাহে এবং বলে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি আর তারা মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চাই তারা প্রকৃত কাফির এবং কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছে (সুরা নিসা : ১৫০-১৫১)।

আল্লাহ্র নির্বাচিত / মনোনীত ব্যক্তির সাথে কিতাবের সম্পর্ক

১. হে মানব। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমান এসেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি (সুরা মায়েদা : ১৫)।

২. আল্লাহ্র নিকট হতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট এসেছে (সুরা আহযাব : ৪৫-৪৬)।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী শরহে শেফালি লিখেছেন নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব উভয়টি দ্বারা রাসুল (সা.) হলেন গুণাবলী সত্তা বিধান ও সংবাদ তথা ওহীর প্রকাশ ও বিকাশ স্থল। রাসুল (সা.) নূর এভাবে যে, তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র মহান সত্তা থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হন এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যান্য লোকেরা ফয়েজ লাভ করে থাকে। এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, কেউ নুরে মোহাম্মদীকে যেভাবে পাবে না। এর মাধ্যমে এটাও বোঝা গেল যে, রাসুল (সা.) কে বাদ দিয়ে কোরআন বুঝা সম্ভব নয়। কারণ আলো ব্যতীত কোন কিতাব পড়া সম্ভব নয় আরো জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়েত দান করেন তা রাসুল (সা.) এর মাধ্যমে করবেন।

উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী রাসুল বা আল্লাহ্‌র নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাথে আল্লাহ্‌তালা সাময়িক বা স্বল্পকালীন (Part time) সম্পর্ক নয় যেমন এক শ্রেণীর অজ্ঞ লোকরা মনেকরে যে, যখনই আল্লাহ্‌ মানুষের কাছে তার বাণী পৌঁাতে চান শুধু তখনই নবীর সাথে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং কিছুক্ষণ পরই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বরং প্রকৃত ব্যাপার হলো আল্লাহ্‌র এসব নিয়োজিত মহান কর্মকর্তাগণ হলেন আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব তাদের প্রতি সব সময় আল্লাহ্‌তালা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন ও তাদের কাজ কর্মের সার্বক্ষণিক মনিটরিং করেন। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, তাদেরকে বিশেষ দিক নির্দেশনা (যা কেবল ওহীব মাধ্যমেই সীমিত নয়) ও পথ প্রদর্শন করে থাকেন।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত নির্ভুলভাবে প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং তাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন অপছন্দনীয় কাজ না করা হয় বা বলা হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর অটল থাকেন। তাঁদের পুত পবিত্র চরিত্র, নৈতিকতা ও পবিত্রতার এমন এক নমুনা হবেন যার মধ্যে দোষত্রুটির লেশমাত্র নাই। আল্লাহ্‌তায়ালা বিশেষ করে তার মনোনীত কর্মকর্তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত নমুনা (Model) এ জন্য বানিয়েছেন যে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেউ তাঁর প্রিয় হাত চাইলে সে যেন নির্ভয়েও নিহসংকোচে তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারেন। তাছাড়া আল্লাহ্‌তায়ালার পছন্দনীয় ব্যক্তির বাস্তব নমুনা থাকা অতীব প্রয়োজন। এ কারণেও ঐশী গ্রন্থের বাস্তব নমুনা স্বরূপ আল্লাহ্‌র মনোনীত জীবন্ত আদর্শ (Living Model) থাকা অত্যাবশ্যক। এ প্রেক্ষিতেই রাসুল (সা.) কে জীবন্ত কোরআন বা হযরত আলী (আ.) নিজেকে সবাক কোরআন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে একটি অতি গুরুত্ব বিষয় এই যে, কোন পুস্তক স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোন মানুষকে হেদায়েত করতে পারে না বরং তা থেকে একটি তত্ত্ব, তথ্য বা কর্মসূচির ধারণা বা রূপরেখা পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তব নমুনা ছাড়া তা জীবন ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা সম্ভবনয়। এ কারণে ঐশী পুস্তকের বাস্তব নমুনাও আল্লাহ্‌র নির্বাচিত ব্যক্তির মধ্যে স্বত বিরাজমান থাকে বিধায় আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির মান্যতা এত গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করেছেন।

ঐশী গ্রন্থের সাথে আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপার রাসূল (সা.) যা বলেছেন তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অনুসরণ করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি রাসুল (সা.) কে দেখেছি তিনি বিদায় হজে আরাফাতের দিন তার কাসওয়া নামক উষ্ট্রের উপর সওয়ার অবস্থায় ভাষণ দান করেছিলেন। ভাষণে তিনি বলেন, হে লোক সকল। আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিষ রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা এটাকে শক্ত করে ধরে রাখ (অনুকরণ ও অনুসরণ ও মান্য) তবে গোমরাহ (পথভ্রষ্ঠ) হবে না। যদি একটিকে ছাড়া তাহলেও পথভ্রষ্ঠ হয়ে যাবে। তার প্রথমটি হলো আল্লাহ্‌র কিতাব (পবিত্র কোরআন) দ্বিতীয়টি হলো আমার ইতরাত, আহলে বাইত বা আহলে কিতাব এ দুটি কখনও পরস্পর হতে

বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না হাউজে কাউসারে আমার সঙ্গে মিলিতহবে। আমি দেখবো তোমরা এদের সাথে কিরূপ আচরণ কর। মহানবী (সা.) সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, এখানে উপস্থিত লোকদের উচিত অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমায় এ বাণী পৌঁছে দেওয়া। কেননা যাদের কাছে পৌছানো হবে, তাদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন আছে যে, শ্রবণকারীর চেয়ে সংরক্ষণের দিক থেকে অধিক যোগ্য। আর তোমরা যেন আমার পরে কাফের হয়ে যেওনা। অর্থাৎ রাসুলের এই নির্দেশ প্রতিপালন না করা হলে এই উম্মাত কার্যত কাফের হয়ে যাবে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) হলেন আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত সাক্ষী তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করা বা পর্যবেক্ষণ করা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্যের অর্ন্তরভুক্ত-এরশাদহচ্ছে : এভাবে আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য াক্ষী হতে পার, আর রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হবে (সূরা বাকারা : ১৪৩)।

পীর মান্যতা-ইবাদত-শিরক-বিদআত প্রসঙ্গে

পীর মান্যতা বা পীর ভক্তি বা এদের প্রতি ভালবাসা শ্রদ্ধা ও আদব কায়দার ভিত্তি হলো রাসুল (সা.)। এ পর্যায়ে আমরা রাসুল (সা.) এর সাথে উম্মতদের সম্পর্ক, রাসুলের প্রতি আনুগত্য ভক্তি, শ্রদ্ধা,ভালবাসা, আদব কায়দা সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা।

রাসুলের সাথে তার উম্মতের সম্পর্ক

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা: নবী বিশ্বাসীদের কাঝে নিজেদের চেয়ে আপন (নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয়), আর তার স্ত্রীগণ তাদের মায়ের সমান (সুরা আহযাব : ৬)।

রাসুলের (সা.) সম্মানিত স্ত্রীগণ সামাজিক বা মৌখিক মায়ের মত নয়, বরং এটি এমন ধরনের গভীর আধ্যাত্মিক ও রুহানী সম্পর্ক যে রাসূলের মৃত্যুর পর এই পবিত্র সম্পর্ক অম্লান থাকবে যে কারণে মুসলমানদের এই মর্মে আল্লাহ্র তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহ্র রাসুলকে কষ্ট দেওয়া বা তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করা কখনও সঙ্গত হইবে না।্আল্লাহ্র দৃষিএত এ গুরুতর অপরাধ (সুরা আহযাব : ৫৩)।

উপর্যুক্ত আয়াত দুটির মর্মানুযায়ী রাসুল (সা.) হলেন উম্মতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় রুহানী পিতা, তাই তিনি কোন কারণে কষ্ট বা দুঃখ পান এমন কাজ করা উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ বা হারাম।

আল্লাহ্তালা রাসুল (সা.) এর আনুগত্রকে তাঁর প্রতি আনুগত্যের সম মর্যাদাসম্পন্ন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, যে রাসুলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে (সুরা নিসা : ৮০)। এই আনুগত্যের বাস্তব মান্যতা এমন যে, যদি কেহ রাসুলের সম্মুখে উচ্চ স্বরে বা বেয়াদবীর সুরে কথা বলে বা মহান রাসুলের সাথে অনাবশ্যক কুতর্কে লিপ্তহয় বা তার কথায় বাধা প্রদান করে বা নির্দেশ প্রতিপালন করতে ইশারা-ইঙ্গিতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তার সমস্ত সৎকর্মরূপে আমল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। ফলে সে আল্লাহ্র দরবারে ঘোর পাপী তথা বেঈমান পরিগণিতহয়। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: হে আমানুগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চ স্বরে কথা বল তাঁর সাথে সেই রূপ উচ্চ স্বরে কথা বল না। কারণ, এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে যারা আল্লাহ্ রাসূলের সম্মুখে কণ্ঠস্বর নীচু করে। আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে তাকওয়ার জন্য

পরীক্ষা করার লা তাদের জন্য রয়েছৈ ক্ষমা ও পুরস্কার। যারা ঘরের বাইরে হতে তোমাকে উচ্চ স্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ (সূরা হুজ্জরাত : ২-৪)।

আল্লাহ্ রাসূলের সাথে কোন গোপন কথা বা একান্তভাবে কথা বলার আদব হিসাবে কথা বলার পূর্বে সাদাকা দেওয়ার বিধান ধার্য করেছে এরশাদ হচ্ছে : হে আমানুগণ তোমরা রাসূলের সাথে চুপি চুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে সাদাকা প্রদান করবে। যা তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পরিশোধক। যদি তাতে অক্ষম হও, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সূরা মুজাদালা : ১২)।

নবী গৃহে প্রবেশ নিষেজ্ঞার ব্যাপারে কোরআনে বলা হচ্ছে : "হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে, খাবার তৈরির জন্য অপেক্ষা না করে খাওয়ার জন্য তোমরা নবীর বাড়ির ভিতরে ঢুকবেনা। তবে তোমাদের ডাকা হলে তোমরা যাবে ও খাওয়ার পর তোমরা চলে যাবে। কথাবার্তায় তোমরা এঁটে যেওনা, এমন (ব্যবহার) নবীর বিরক্তি সৃষ্টি করে। সে তোমাদের উঠে যাওয়ার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু সত্য কথা বলতে আল্লাহ্র সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাইব। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারো পক্ষে আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেওয়া নংগত নই (সূরা আইয়াব : ৫৩)।

নবীর পরিবারের সদস্য বা মহা পবিত্র তথা সর্বশ্রেষ্ঠ ও তাদের বিশ্ববাসীর মহাজ্ঞান কেন্দ্র এ ব্যাপারে কোরআনে উল্লখ করা হয়েছে যে, হে নবী পরিবার। আল্লাহ্ তো কেবল চাই তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। আল্লাহ্র আয়াত ও জ্ঞানের কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত (আলোচিত) হয় তা তোমারা স্মরণে রাখবে, আল্লাহ্ অতি সূক্ষদূর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত।

নবী পরিবারের সদস্যগণ ধর্ম ইসলামের জীবন্ত মডেল (Living Model) ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে, "অতঃপর তোমার নিকট যখন জ্ঞান এসে গেছে। এরপরও যদি কেউ (খ্রিস্টান) তোমার সাথে তার হিসাব) সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে। তবে বলা (আচ্ছা ময়দানে) এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের এবং আমাদের সত্তাদের এবং তোমাদের সত্তাদের,অতঃপর সকরে মিলে (আল্লাহ্র দরবারে) নিবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাদ বকুল করি (সূরা আলে ইমরান : ৬১)। রাসূল (সা.) হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে নাজরানের খ্রিস্টানদের অনেক বুঝালেন যে, তাকে যেন আল্লাহ্র পুত্র যা বলে, তিনি হযরত আদম (আ.) এর উদাহরণও দিলেন। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনল না। অবশেষে তিনি আল্লাহ্র আদেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে দেখাও মিথ্যাবাদীদের উপর অভিশাপ বর্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যাকে মুবাহিলা তথা প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ বলে। স্থির করা হলো যে, নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে উভয় পক্ষ (নিজ নিজ পরিবারের সদস্য) পুত্রদের, নারীদের (কন্যাগণ) এবং তাদের নিজেদের সত্তা বলে গণ্য হওয়ার (যার) ব্যক্তিদের নিয়ে একত্র হবে এব প্রত্যেকে অপরের প্রতি অভিসম্পাদত ও আল্লাহ্র শাস্তি কামনা করবে। মুবাহিলার দিন সাহাবারীরা সুসজ্জিত হয়ে রাসূলের গৃহে এ আশায় জমা হলেন যে, হযরত রাসূল (সা.) তাদেরকে এই প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ সাথে নিবেন। কিন্তু রাসূল (সা.) সেদিন প্রতুষ্যে হযরত সোলেমান ফারসী (রা.) কে একটি লাল কম্বল ও চারটি কাঠের খুঁটি দিয়ে সেই ময়দানে একটি ছোট সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে সেই ময়দানে একটি ছোট সামিয়ানা টাঙ্গাতে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) ইমাম হোসাইন (আ.) কে কোলে নিয়ে ইমাম হাসানের (আ.) হাত ধরলেন এবং হযরত ফাতিমা (আ.) কে নিজের পিছনে আর যরত আলী (আ.) কে তার পিছনে রাখলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র নিদের্শ অনুযায়ী ছেলেদের স্থানে নাতিদের, নারীদের স্থানে কন্যাদের এবং মত্তা বলে পণ্যদের স্থানে হযরত আলী (আ.) কে নিলেন এবং দোয়া করৈন, "হে আল্লাহ্

প্রত্যেক নবীর আহলে বাইত থাকে এরা আমার আহলে বাইত। এদের সকল দোষত্রুটি হতে মুক্ত ও পবিত্র রেখ। রাসূল (সা.) পরিবারের সদস্য সম্পর্কে এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীরা যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করেছেন এ ঘটনা থেকে তা স্মনিশ্চিতভাবে জানা গেল। রাসূল (সা.) কে তাঁর পরিবারের সম্মানিত সদস্যদের এক সাথে দেখে খৃস্টানদের নেতা আকবর বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি এমন নুরানী চেহারা প্রত্যক্ষ করেছি যে, এরা যদি পাহাড়কে নিজ স্থান হতে সরে যেতে বলেন, তবে তা অবশ্যই সরে যাবে। সুতরাং মুবাহিলা হতে হাত গুটিয়ে নেয়াই অধিকতর কল্যাণকর। অন্যথা কিয়ামত অবধি খৃস্টানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। পরিশেষে তারা জিজিয়া কর দিতে সম্মত হলো। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম এরা যদি মুবাহিলা করত তবে আল্লাহ্ তাদের বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিতেন এবং ময়দান আগুনে পরিণত হত আর না মরলের একটি প্রাণী এমন কি পাখি পর্যন্ত রক্ষা পেত না। এটি হযরত আলী (আ.) উচ্চ স্তরের কথিত যে, তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে রাসূলের নফস জীবন বা অনুরূপ সত্তা বা জীবন-প্রণি সম মর্যাদা সম্পন্ন সাব্যস্ত হলেন। তাই তিনি যে আল্লাহ্‌র ফায়সালা অনুযায়ী অন্যান্য সাহাবা এমনকি নবীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হিসাবে প্রমাণিত ও ঘোষিত হলেন (তাফসীরে জালালাইন ১ম খণ্ড, পৃ.-৬০ বায়দ্বাভী ১ম খণ্ড, পৃ-৩৯, মিশর মুদ্রণ)।

পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.) এর আহলে বাইত (আ.) এর মুয়াদ্দাত (আনুগত্য) পূর্ণ আমৃত্য প্রাণাধিক ভালবাসা ফরয করে দিয়েছেন। যদি আমরা আহলে বাইতকে আল্লাহ্ নির্দেশ অনুযায়ী ভারোবানসি। তাহলে আল্লাহ্‌র হুকুমে অকার্যকর থেকে থাকে বা আমাদের ফরয কবুল হবে না। তাই এ ব্যাপারে এরশাদ হচ্ছে : বলুন আমি আমার রেসালতের পারিশ্রমিক হিসাবে তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। শুধু আমার কুর বা (নিকটাত্মীয়) আলী ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন এর মোয়াদ্দাত আনুগত্য আমৃত্য ভালবাসা) ব্যতীত (সূরা শুরা : ২৩)।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন এই আয়াত লাযিল হলো তখন সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কারা আপনার নিকট আত্মীয়? যাদের মুয়াদ্দাত (আনুগত্য পূর্ণ প্রাণাধিক ভালবাসা) পবিত্র কোরআন উম্মতের জন্য ফরয করা হয়েছে। উত্তরে নবী (সা.) বললেন, আলী, ফাতেমা, হাসান ও হোসাইন এর মুয়াদ্দাত। (সূরা : কোরআন শরিফ সূরা ২৩) আশরাফ আলী থানভী, পৃ-৬৯২, তাফসীরে মায়যারী খণ্ড ১৪, পৃ.-৬৩, (ইফা) তাফসীরের নুরুল কোরআনে মোক্তা ইসলাম, খণ্ড-২৫, পৃ-৬৭)।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবীর শানে দুরুদ পড়ার নির্দেশ সম্বলিত আয়াত "আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তার ফেরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে আমানুগণ তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও; (সূরা আহযাব : ৬৫)। এ কারণে রাসূলের শানে দরুদ ও সালাম পেশকরার নির্দেশ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে বিধায এর মধ্যে শিরক বিদআতের কোন অবকাশ নাই।

সিরাতে মুস্তাকিম বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? পবিত্র কোরআনে সূরা ফাতিহাতে আমাদের সরল ও সঠিক পথে ও যাদের প্রতি যাদের প্রতি আপনি নেয়ামত দান করেছেন তাদের পরিচালিত করা এখানে তাদের পথ বলতে কাদের পথ বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে সালাবী তার তাফসিরে কবীর প্রগে্ণ (সূরা ফাতিহার তাযমী (র.) ইবনে বুরাইদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, সিরাতে মুস্তাকিম বলতে মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর ইতবৃত্তি আহলে বাইতের পথকে বুঝানো হয়েছে? ওয়াকী ইবনে যাররাহ্ সুফিয়াম সাওরী সাদী আসরাত ও মুজাহিদ হতে এরা সকলেই ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন আমাদের সরল সঠিক পথে হেদায়েত

কর অর্থাৎ মুহাম্মদ ও তাঁর আহলে বাইতের পথে (সূত্র : ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃ-১১১, মালাকেবে ইবনে শাহর আসুব, খণ্ড, ১, পৃ-১৫৬)।

সিরাতুম মুস্তাকিম বা সরল পথের বিবরণ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন : বল আইস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তোমাদিগকে তা পড়ে শুনাই। উহা এই তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করবে না। আমি তোমাদিগকে এবং তাহাদিগকে রিজিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাই যাইবে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। ইয়াতীম বয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হইবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দিবে। আমি কাকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করিনা। যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত অঙ্গীকারপূর্ণ করবে। এইভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর এবং এই পথই আমার সরল পথ (সিরাতুম মুস্তাকিম)। সুতরাং, তোমরা ইহারই অনুসরণ করবে এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবেন না করলে উহা তোমাদিগকে তার পথ হতে বিচ্চিন্ন করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নির্দেশ দিলেন যেন খোদাভীরু/পরহেজগার বা মুত্তকীন হতে পার (সূরা আল আম: ১৫১-১৫৩)।

আল্লাহ্র ইবাদত-শিরক-বিদআত প্রসঙ্গে

আরবী ভাষায় "ইবাদত" এর আসল অর্থ বাধ্য হওয়া, অনুগত হওয়া, কারো সামনে এমনভাবে আত্ম সমর্পণ করা যেন তার মোকাবেলায় কোন প্রতিরোধ, অবাধ্যতা, অকৃতজ্ঞতা হয়, সে তার মর্জিমত যেভাবে খুশি সেবা গ্রহণ করতে পারে। কাজে লাগাতে পারে বা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। আবদ শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি কারো মারিকানাধীন, অধীন স্বাধীন নয়, পরাধীন। এটি স্বাধীন শব্দের বিপরীত। ইবাদত বলা হয় এমন আনুগত্যকে যা পূর্ণ বিনয়ের সাথে করা হয়। এই অর্থ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আবিদ ধাতুর, মৌলিক অর্থ হচ্ছে কারো কর্তৃত্ব প্রাধান্য স্বীকার করে তার মোকাবিলায় নিজ স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাসেবক ত্যাগ করা। ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা ত্যাগ করা অনুগত হয়ে যাওয়া। বন্দেগীর মূল কথা এটাই। সুতরাং এ শব্দ থেকে প্রাথমিক সে ধারণা সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে গোলামী, বন্দেগী, দাসত্বের বা অধীনতার ধারণা। একজন আদর্শ অনুগত ব্যক্তি তিনিই যিনি স্বীয় মানবের আনুগত্যে শুধু নিজেকে সোপদই করেন না বরং তার বিশ্বস্ততা, শ্রেষ্ঠত্ব কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। তাই তার মান মর্যাদারও ব্যাপারে তার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার জন্য কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন। এমনি করেই বন্দেগীর সকল আনুষ্ঠানিকতা যথারীতি পালন করে থাকে এবং এক পর্যায়ে সেই আনুষ্ঠানিকতাও পালন করে যার নাম, পূজা, আরাধনা, উপাসনা। ইসলাম ধর্মে নামে আনুষ্ঠানিকতার প্রতিপালনের এক পর্যায়ে মুসলমানরা সেজদায় দেহ, মন, প্রাণ দৃশ্যত আল্লাহ্র ওয়াস্তে সমর্পণ করে। এ কারণে এক শ্রেণির অজ্ঞ ব্যক্তি সেজদা নিয়ে এতই বাড়াবাড়ি করেন যে, নামাজে যে সেজদা করা হয় তাছাড়া যে অনেক পদ্ধতিতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য ব্যক্তি গোষ্ঠি, প্রতিষ্ঠান, শক্তি, মতবাদ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বিধি বিধান, মতবাদ তথা আধুনিক পরিভাষায় বিভিন্ন ধরনের Ism & Crecy এর ইবাদত করে মুসলিম সমাজ মহা শিরকে নিমগ্ন রয়েছে তা কল্পনাও করছে না বা কল্পনা করতে দেওয়া হচ্ছে না। অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন চেতনাই নাই। আর এবার গায়রুল্লাহ্র ইবাদত যে অপাত্রে

সেজদার চেয়েও ভয়াবহ অপরাধ তা কেউ বলছে না বা মুসলিম জাতির পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে এ ব্যাপারে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে এগিয়ে আসছেন না।

এ ব্যাপারে কোরআনে বর্ণিত সর্ব প্রথম শয়তানের অপরাধ নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আল্লাহ্তালা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যে সব পদার্থ, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সত্তাকে ইবাদত করে থাকে তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। এসব বিষয়গুলোতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের ইবাদতের উল্লেখ রয়েছে। যেখানে ইবাদতের অর্থ দাসত্ব, আনুগত্য, সেখানে মাবুদ হয় শয়তান অথবা সেসব বিদ্রোহীদের দ্বারা আল্লাহ্র পরিবর্তে নিজেদের বন্দেগী-আনুগত্য করেছে অথবা এমন সব নেতা কর্তা ব্যক্তি যারা কিতাবুল্লাহ্র পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মত-পথ-চিন্তা-চেতনায়, আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে জনগণকে চারিত করে আসছে আর সেখানে ইবাদতের অর্থ ূজা, সেখানে মাবুদ হচ্ছে আম্বিয়া জ্বিন, ফেরেশতা, নিছক ভ্রান্ত ধারণা বশত প্রাকৃতিক রবুবিয়াতে তাদেরকে শরীক মনে করা হয়েছে। কোরআন এসব রকমের মাবুদকেই বাতিল এবং তাদের ইবাদতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করে। তাদের গোলামী, আনুগত্য, পূজা যাই করা হোক না কেন কোরআন বলে তোমাদের এসব মাবুদ যাদের পূজা করছো তারাও আল্লাহ্র অধীন কোন শক্তি, সত্তা, ব্যক্তি যে প্রতিষ্ঠান। তাই তেমোদের ইবাদত পাওয়ার কোন অধিকার তাদের নাই। জ্বিন ও মানুষ সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান যে শিরকে লিপ্ত অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সত্তার ইবাদত করে মনে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করে তাহলো খেয়াল খুশির প্রবৃত্তির ইবাদত, আরাধনা বা উপাসনা করা। ইরশাদ হচ্ছে : তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে যে তার খেয়াল খুশি প্রবৃত্তি নিজ ইলাহ (উপাস্য/প্রভু/ইবাদতের কেন্দ্র হিসেবে) বানাইয়া লইয়াছে? আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে বিভ্রান্ত করছেন এব তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করি দিয়েছেন এব চক্ষুর উপর রেখেছেন আবরন। অতএব আল্লাহ্র পরে তাকে পথ নির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। ওরা (খেয়াল খুশির উপাসকগণ) বলে একমাত্র জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি। আর কালই আমাদিগ্যকে ধ্বংস করে। বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নাই উহারা তো কেবল মন গড়া কথা বলে (সূরা জাসিয়অ : ২৩-২৪)।

শয়তানের অপরাধ সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা স্মরণ করো তোমার প্রতিপালক ফেরেশ্তাদের বলেছেন, আমি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছি যখন আমি তাকে সুঠাম করবো আর ওর মধ্যে আমার রুহ সঞ্চার করবো তখন তোমরা একে সেজদা করবে। (সেজদা করা শিরক নয় তা আল্লাহ্র এই নির্দেশের মাধ্যমেই জানা গেল সিজদা করাই যদি শিরক হতো তাহলে আল্লাহ্ স্বয়ং শিরক করার নির্দেশ দিতেন না)। তখন ফেরেশতারা সকলেই সেজদা করলো, ইবলীস ছাড়া, সে অহংকার করলো। আর অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হলো। তোমার প্রতিপালক বলনে, হে-ইবলীস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সেজদা করেতে তোমাকে কে বাধা দিল? তোমার অহংকার কি খুবই বেশি না তোমার মান বড়ই উচু? ইবলীস বলল। আমি তার চেয়ে বড়। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর ওকে (আদম) কে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। তিনি বলরেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কারণ তুমি অভিশপ্ত এবং তোমার উপর আমার লালত স্থায়ী হইবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত (সূরা সাদ : ৭১-৭৮)।

পবিত্র কোরআনের উল্লেখিত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মানুষকে সেজদা না করাই হলো শয়তানের প্রথম ও প্রধান অপরাধ। আর এর কারণ হলো শয়তানের ভুল/বিভ্রান্তকর মতাদর্শ চিন্তাধারা/ মতবাদ/ জীবন দর্শন। ইবলীস তার সীমিত জ্ঞান নিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, যেহেতু তার বিবেচনা অনুযায়ী আগুন মাটির চেয়ে ক্ষমতাশালী আর যেহেতু সে আগুনের সৃষ্টি তাই সে আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই ঘটনা থেকে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ভুল বা বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা, আনুগত্যে বা মান্যতা

হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ। আর এই ধরনের আনুগত্যকেই প্রকৃত পক্ষে ইবাদত হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং দৃশ্যত সেজদার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ সেজদা না করেও শিরক করা হতে পারে। কারণ শয়তান আল্লাহ্ পূজারী না হয়ে বা আল্লাহ্র আবাদত পরিত্যাগ করে নিজের খেয়াল খুশির পূজারী বা প্রবৃত্তির পূজারী হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী প্রবৃত্তি পূজা তথা আত্ম পূজা বা নফসের উপাসনা তথা মান্য তাই পৃথিবীর জঘন্যতম শিরক তথা আল্লাহ্র সাথে শরীক করার মত ভয়াবহ অপরাধ। "তাগুত" তথা ধর্মহীন রাষ্ট্রয় কর্মকাণ্ডের অনুরণকে কোরআনের ভাসায় "তাগুত" বলা হয়েছে। আর এধরনের রাষ্ট্রের অন্ধ অনুসরণকারী নাগরিককে তাগুতের ইবাদতকারী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী "তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আতীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে (সূরা মুহাম্মদ : ২২)।

এই ধরনের জালেম শাহীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা প্রত্যেক সৎ-নাগরিকদের ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব। অথচ অনেক লোকই এ সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা না করে এ ধরণের রাষ্ট্রের পোষকতা ও মান্যতা দান করে। ইরশাদ হচ্ছে : বল আল্লাহ্র নিকট ফাসেকদের চেয়েও নিকৃষ্টতর পরিণতি কাদের আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো?তারা যাদের উপর আল্লাহ্ লাণিত করেছেন, যাদের উপর আল্লাহ্র প নিপতিত হয়েছে যাদের অনেকেই তাঁর নির্দেশে বানর, শুকরে পরিণত হয়েছে। আর তারা তাগুতের ইবাদত-বন্দেগী করেছে। এরাই হচ্ছে নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোক। আর সত্য সরল পথ থেকে ওরা তো অনেক দূরে সরে গিয়েছে" (সরা মায়েদা : ৬০)।

আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাগুতের ইবাদত থেকে বিরত থাকো এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমরা প্রতিটি কওমের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করেছি (সূরা আল-নহল : ৩৬)।

যারা তাগুতের ইবাদত পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে–তাদের জন্য সুসংবাদ (সূরা আজ-জুমার : ১৭)।

উল্লেখ্য তাগুতের ইবাদতের সাথে সিজদার কোন সম্পর্ক নাই।

আল্লাহ্ বলেন, হে বনি আদম, আমি কি তোমাদেরকে তাকিদ করি নাই যে, শয়তানের ইবাদত করো না? কারণ সে তো আমাদের প্রকাশ্যে দুশমন (সূরা ইয়াসীন ৬০)। আমরা সবাই জানি, দৃশ্যত কেউ শয়তানের পূজা করে না। বরং সব দিক থেকে তার উপর অভিসম্পতেই বর্ষিত হয়। সুতরাং; কিয়ামতের দিন বনি আদমের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে অভিযোগ দায়ের করা হবে তা এ জন্য হবে না যে, তারা শয়তানের পূজা উপাসনা বা সেজদা করেছে বরং তা হচ্ছে এ জন্য যে, তারা শয়তানের কথা মতো চলেছিল তার বিধান বা নির্দেশের আনুগত্য করেছিলে, সে যে পথের প্রতি ইঙ্গিত করেছে বা জীবন দর্শন অনুসরণ করতে বলেছে সে পথেই তারা ছুটে চলেছিলো। শয়তানের ইবাদত সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা... মে (শয়তান) তো তোমাদের প্রকাশ্যে শত্রু। সে তো কেবল তোমাদের মন্দ ও অশ্লীলকাজের নির্দেশ দেয়। আর সে চায় যে, আল্লাহ্র সম্বন্ধে তোমরা যা জান না সেবল। (সূরা বাকারা : ১৬৮)।

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্র সম্বন্ধে তর্ক করে ও প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের অনুসরণ (ইবাদত করে)। শয়তান সম্বন্ধে এ নিয়ম করে দেওয়া হয়েছে যে, যে কেউ তার সাথে বন্ধত্ব (ইবাদত) করবে সে তাকে পথভ্রষ্ট করবে ও তাকে জলন্ত আগুনের দিকে নিয়ে যাবে (সূরা হজ্ব : ৩-৪)।

হে আমান্যগণ, মন, জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য পরীক্ষার তীর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ; সুতরাং; তোমরা তা বর্জন করো যাতে তোমরা সফল হতে পারে, শয়তান তো মদ ও জুয়া দিয়ে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাত চায়। আর তোমাদের আল্লাহ্র ধ্যানে ও নামাযে বাধা দিতে চায়। তাহলে তোমরা কি বিরত হবে না।

উপর্যুক্ত আয়াত ও অনুরূপ আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল শয়তানের ইবাদতকারীরা হলো সেই সব ব্যক্তি যারা শয়তানের পছন্দ ও পরামর্শ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় কাজ করে থাকে। জ্বিনদের ইবাদত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে, স্মরণ কর, যেদিন তিনি ইহাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহারা কি তোমাদেরই পূজা করিত? ফেরেশতারা বলবে। তুমি পবিত্র মহান তুমি আমাদের অভিভাবক। উহারা নহে বরং উহারা তো পূজা করিত জ্বিনদের এবং উহাদের অধিকাংশই ছিল উহাদের (জিনদের) প্রতি বিশ্বাসী (সূরা সাবা :৪০-৪১)।

জিনদের উপর ঈমান আনতে তাদের পূজা করা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে আর ও এই যে, কতিপয় মানুষ কতক মানুষ জ্বিনদের শরন লহত ফলে উহারা (মানুষ) জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দিত" (সূরা জিন : ৬)। এখানে আল্‌রাহ্‌তালার বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, জিনদের ইবাদতের অর্থ হলো। তাদরকে বন্দেগীর গুণাবলী থেকে উন্নত এবং খোদায়ী গুণাবলীতে বিভুষ্ঠিত মনে করা। তাদেরকে গায়েবী সাহায্য, মুশকিল দূরীকরণ, ফরিয়াদে হাজির হতে সক্ষম জ্ঞান করা এবং তাদের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে সম্মানের যে সব অনুষ্ঠান পালন করা যা পূজার সীমা পর্যন্ত পৌঁছেছে।

সূরা "সাবার" বর্ণিত আয়াতে (৪০-৪১) আল্লাহ্‌তালা ফেরেশ্‌তাদের ইবাদতের অর্থ তাদের পূজা করা। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, পবিত্র কোরআনে এক শ্রেণির লোক ফেরেশ্‌তাকে "আল্লাহ্‌র" কন্যা (নাউজুবিল্লাহ্‌) হিসাবে মনে করতো। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর অনেক জাতির লোক ফেরেশতাদের অবস্থান, আকৃতি ও কাল্পনিক প্রতিকৃতি তৈরী করে তাদের দেব-দেবী হিসাবে কল্পনা করে তাদের পূজা করতো। আর এর কারণ হিসাবে তারা ধারণা করতো যে, এরা আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের জন্য সুপারিশকারী। অথবা আর যারা আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে অন্যদের বন্ধু বানিয়ে রেখেছে তারা বলে। এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করবে-কেবল এ জন্যই তো আমরা তাদের ইবাদত করেছি (সূরা আর যুমার : ৩)।

সামাজিকভাবে যেসব প্রভাব ও প্রতিপত্তিশী ব্যক্তিত্বের ইবাদত করে মানবজাতি দুনিয়ায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও পরলোকে অধিকতর বিপদগ্রস্ত হবে তাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন : তারা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তাদের আলেম-মাশায়েখ ও দৃশ্যত পণ্ডিত ধর্ম পরায়ন ব্যক্তিবর্গকে তাদের ইলাহারূপে গ্রহণ করেছে" (সূরা তাওবা : ৩১)।

২. আল্লাহ্‌ কাফিরদিগকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জ্বলন্ত অগ্নি। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং ওরা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাইবে না। সেদিন তাদের মুখমণ্ডল অগ্নিতে উলটপালট করা হইবে সেদিন তারা বলবে। হায় আমরা যদি আল্লাহ্‌কে জানতাম ও রাসূলকে মানতাম তারা আরও বলবে, হে আমাদরে প্রতিপালক আমরা আমাদের 'সাদাত' (রাজনৈতিক নেতা/ ধর্মীয় নেতা) ও কুবরাদের সামাজিকভাবে প্রভাবশালী/ চিন্তাবিদ যাদের মতামত/সিদ্ধান্তে জীবন দর্শন ফতোয়া মান্য করা হয়) আনুগত্য করিছিলাম এবং উহা আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক। উহাদিগকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং উহাদিগকে দাও মহা অভিসম্পাত। (সূরা আহযাব : ৬৪-৬৮)।

৩. তারা কি এমন উপাস্য (শরীক) বানিয়ে বসেছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের ব্যাপারে এমন সব আইন-বিধান রচনা করেছে আল্লাহ্‌ যার অনুমতি দেননি, দেননি কোন হুকুম। (সূরা শুরা : ২১)। ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হবে এটাই হতো। নিশ্চয়ই জালিমের জন্য রয়েছে মর্মন্তদ শাস্তি।

মানব সমাজে রাজনৈতিক নেতা, চিন্তাবিদ, দার্শনিক বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ সংস্কারক, ধর্শীয় নেতা, অর্থাৎ আলেম, মাশায়েখ, ফকীহ্‌গণের বক্তব্য/মতামত/সিদ্ধান্ত। জনগণ পবিত্র কোরআনের আলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকেন। এ ধরণের ব্যক্তিবর্গের নির্দেশনা অনুকরণ ও অনুসরণের

ফরে মানবজাতি দুনিয়ায় ও আখেরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হতে থাকবে মর্মে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তালা ঘোষণা করে মানব জাতিকে স্মরণ ও সতর্ক করে দিয়েছেন।্ প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে, রাসুল (সা.) এর ওফাতের পর আল্লাহ্র দুশমন উমাইয়া বংশ ৬৬১-৭৫০ খৃষ্টাব্দ পরবর্তীতে তাদের মতাদর্শের অনুসারী আব্বাসীয় ৭৫০-১২৫৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতথেকে পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা, জাল-মিথ্যা হাদীসের আলোকে এক ধরণের আলেম/ মাশায়েখ/ ফকীহ্ তৈরী করতে সমর্থ হয় তারা আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সা.) এর মূল নির্দেশকে পাশ কাটিয়ে ইসলামের নাম দিয়ে এক নতুন ধর্মমত চালু করে। এরই ধারাবাহিতায় তারা মূল ধর্ম ইসলাম এর মধ্য ব্যাপক মতবিরোধ, মতানৈক্য ফিরকাবাজী মাযহাবী বিতর্ক, শিয়া সুন্নী বিতর্ক সৃষ্টি করে নিত্য নতুন আইন কানুনবিধি বিধান আমদানী করে। এ কারণেই আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নবী-রাসূল-ওলী-উলিল আমর, ইসাম, হাদী, মুর্শেদ প্রভৃতি মহাত্মাগণকে ভালবাসা মান্য করাকে এই নতুন আলেম শ্রেণি শিরক, বিদআত আখ্যা দিয়ে তাদের থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করে নিজেরা বিভ্রান্তি হচ্ছেন এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করছেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে এদের ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করার তৌফিক দান করুন যাতে আমরা মহান আল্লাহ্ ও তার রাসূলের পুর্ণাঙ্গ অনুসারী হতে পারি।

শিরক এর বিষয়টি অধিকতর স্পষ্টীকরণ করার জন্য আমরা বলতে চাই যে, এক ধরণের আলেম মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি কৌশল ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রশাসনিক বিন্যাস Administrative Strnetune সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও আল্রাহ্তালা ও রাসূল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বিভ্রান্তিকর ধারণা পোষণ করেন। ফলে তারা ধারণা করতেই পারেন না যে, আল্লাহ্তালার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে আল্লাহ্ কি অসাধরণ ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। পবিত্র কোরআনে এ ধরণের অসংখ্য বিষয় বস্তু ও ঘটনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও এসব তথাকথিত অজ্ঞ আলেমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে উম্মী বা মূর্খ, তিনি গায়ের জানতেন না। তার কোন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না ইত্যাদি বলে বা লিখে থাকেন। অথচ আমরা পবিত্র কোরআনে দেখতে পাই হযরত মুসা (আ.) এর পার্থিব শিক্ষক হিসাবে আল্লাহ্র এক বিশেষ বান্দা (খিজির আ.) গায়েবী জ্ঞান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে দৃশ্যত একজন মাসুম বালককে হত্যা করার জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত। হযরত সুলায়মান (আ.) সমগ্র প্রাণী জগতের ভাষা জানতেন, বাতাস তার আপন ছিল তিনি সকালে ১ মাসের রাস্তা (বাতাসের গতিতে) ও সন্ধ্যায় এক এক মাসের রাস্তা পরিশ্রমন করতেন। হযরত ঈসা (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় মাটির মূতির ন্যায় পদার্থকে জীবন্ত পাখী হিসাবে সৃষ্টিসহ মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করতেন। অনুরূপ ক্ষমতা হযরত ইব্রাহীম ও প্রদর্শন করেছিলেন। এ ধরণের ক্ষমতা যে রাসূল (সা.) তার জীবনে দেখিয়েছিলেন তা পবিত্র হাদিসগ্রন্থে ও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বে এসব জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্র এই মহাসম্মানিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষমতার স্বরূপ অবগত নয়। এমন কি তারা বলে থাকেন যেহেতু এই পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ্তালা তাই অন্যকেহ কিছু দিতে পারেনা বা তাদের কোন মালিকানা বা ক্ষমতাই নাই তাই তা শিরকের মত ভয়াবহ অপরাধ। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্তালা এই পৃথিবীর মালিকানা, শাসন কর্তৃক, প্রশাসনিক দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিশেষজ্ঞদের উপহার হিসাবে (Special Gift of God/Allah) সালেহীন ব্যক্তিদের দান করেছেন এই মহাসত্যটি বেমালুম ভুলেই থাকেন এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করে শিরকের ভয় দেখিয়ে তাদের নির্ঘাত দোজখের ভয় দেখান।

পবিত্র কোরআনে এই পৃথিবীর মালিকানা সম্পর্কে বর্ণনা

১। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবতে প্রতিনিধিত্ব (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত/ ক্ষমতাপ্রাপ্ত/প্রশাসক/মালিক/ কর্তৃত্বশালী/ নেতা ইত্যাদি) দান করবেন যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দারন করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এব তিনি অবশ্যই তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন" (সূরা নূর : ৫৫)।
২। এবং তাদেরকে করেছিলেন ইমাম/ নেতা/ প্রশাসক কর্তৃত্বপ্রাপ্ত/ দায়িত্বশীল/ মালিক/ শাসক ইত্যাদি তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত" (সূরা আম্বিয়া : ৭৩)।
৩। আমি উপদেশের পর যবুর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার সৎকর্মশীল বান্দারা এই পৃথিবীর মালিক/ উত্তরাধিকারী/ প্রশাসক/ নেতৃত্বশীল হবে (সূরা আম্বিয়া : ১০৫)।
এই আয়াতের মর্মানুযায়ী পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও খোদায়ী এই বিধান কার্যকর রয়েছে। এ কারণেই রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর তাঁর একনিষ্ঠ উত্তরাধিকারী হিসাবে নায়েবে রাসূলগণ এক অসাধারণ, সামরিক/ মানসিক/ জ্ঞানগত সর্বোপরি আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক ক্ষমতা বলে ইসলাম ধর্ম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন যা সর্বজনবিদিত। অথচ এই খোদাদ্রোহী আলেমরা বরে থাকেন নবী-রাসূলদের ওলীদে মান্য কর ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা করা, তাদের কবরে যাওয়া, তাদের জন্ম, শিক্ষা, জীবন দর্শন, জ্ঞান সাধনা আল্লাহ্ প্রাপ্তির প্রচেষ্টা, মৃত্যু বিষয়ক আলোচনা শিরক বা বিদআত তথা পরিত্যাজ্য। ইতোমধ্যে আমরা পবিত্র কোরআন থেকে জানতে পেরেছি যে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে সে সব সত্তা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে মানুষ ইবাদত করে বা করতো তা স্বয়ং আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। তাই এ ব্যাপারে কষ্ট কল্পনার মাধ্যমে বিষয়টি অধিকতর জটিল করে বর্ণনা করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো ঠিক কঠিন গোনাহ্ এবং যেহেতু সব আলেমগণ অবৈধ ক্ষমতা দখলদার উমাইয়া-আব্বাসীয়দের/ আশীর্বাদপুষ্ট এবং তাদের অনুসারীদের দোসর। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ্ তাদেরকে লানত করেন আর করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন (সূরা মুহাম্মদ : ২২-২৩)।
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ও তার অনুসারী অবৈধ আলেমদের অন্ধ ও বধির হওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্তালা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
আর আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তদ্বারা তাহারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে তদ্বারা দেখেনা এবং তাদের কর্ণ আছে তদ্বারা শ্রবণ করেনা এরা পশুর ন্যায় বরং উহারা অধিক বিভ্রান্ত। এরাই গাফিল (সূরা আরাফ : ১৭৯)।
২. তুমি কি মনে করো যে, ওদের বেশীর ভাগেই শুনে বুঝে? ওরা তো পশুরই মত বরং ওরা আরও পথভ্রষ্ঠ (সূরা ফুরকান : ৪৪)।
৩. ওরাই তারা আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কান মোহর করে দিয়েছেন। তাদের চোখের উপর পর্দা রয়েছে। সুতরাং তারা ফিরবে না (সূরা নাহল : ১০৮)।
৪. তারা বধির, বোবা ও অন্ধ তাই কিছুই বুঝতে পারে না (সুরা বাকারা : ১৭১)।
এই ধরনের ভণ্ডপীর/উলেমা/মাশায়েখ/ফকীহ্দের মাধ্যমে বিপথগামী/ হেদায়েত বর্ধিত হওয়া পবিত্র কোরআনে এই বিষয়টি সকল ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই রয়েছে মর্মে বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মানুষের হেদায়েত তথা জীবন দর্শন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থেকে বঞ্চিত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো ধর্মের নামে এক শ্রেণীর ধর্মীয় নেতৃত্বের মাধ্যমে অধম শিক্ষা তথা বিপথগামী হওয়া।

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত (উলেমা/মাশায়েখ ও সংসার বিরাগীগণ এক শ্রেণির ভণ্ড বিভ্রান্ত পীর) তাদের ইলাহ রূপে গ্রহণ করেছে (সূরা তাওবা : ৩১), এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্তালা আগামীদেরকে এই বিষয়টি জানিয়েছেন যে, এক ধরণের ধর্মীয় নেতা (পীর-উলেমা/ফকীহ্ রাব্বী, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, পাদ্রী) আল্লাহ্র নামে এমন কিছু ধর্মীয় বিধি বিধান প্রণয়ন করে অথবা ব্যাখ্যা প্রদান করে অথবা এমন আদেশ নিষেধ প্রকাশ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে তথা তার অনুসারীদের মানতে বা বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যা মূল ধর্মের মৌলিক দর্শনের পরিপন্থী। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, ইসলাম সহ সকল ধর্মে এই ধরণের ব্যক্তিদের মাধ্যমে জনগণ এক মহা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ইহুদী ধর্ম শাস্ত্রবিদগণই হযরত ঈসা (আ.) ধর্ম প্রচারে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীতে তারাই ধারণা সৃষ্টি করে যে, উজাবের (আ.) আল্লাহ্র পুত্র এবং ইহুদী বা ছাড়া কেহ বেহেশ্তে যেতে পারবে না এবং অবশেষে তাদের চাপে রোমান গভর্ণর ঈসাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করেন। অনুরূপভাবে খৃস্টান ধর্মীয় নেতাগণই ঘোষণা করে ঈসা (আ.) আল্লাহ্র পুত্র এবং খৃস্টানরা ছাড়া আর কেউ বেহেশ্তে যেতে পারবে না। পরবর্তী খৃস্টান ধর্মীয় নেতারা রাজশক্তির (Holy Roman Emprse) এর সহায়তায় প্রজা সাধারণের উপর অত্যাচারের যে স্টীম রোলার চালায় তা আমরা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ দেখতে পাই। সমাজে বিদ্যমান ধর্মীয় বিধি-বিধানের উপর জনগণের এত অশ্রদ্ধা ও অমান্যতার প্রধান কারণ হলো এদের পুরোহিত শ্রেণির সীমাহীন অত্যাচারের ধারাবাহিকতা। বর্তমান সময়ে পবিত্র ইসলাম ধর্মেও এই ধর্মান্ধ উলেমা শ্রেণরি আবির্ভাব ঘটেছে যারা কোরআন ওহাদিস অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এক নতুন ধর্মমত তৈরী করে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই ধর্মকে এজীদী ধর্ম নামে আখ্যায়িত করেছেন। এরা বর্শায় আগায় কোরআন বিদ্ধ করা, গুম খুন, প্রতারণা, ধোকাবাজ, মিথ্যাচার রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে গ্রহণ করে হযরত আলী (আ.) কে ধর্ম পরিত্যাগকারী হিসাবে জাহান্নামে আহেরণ মর্মে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচার করার নীতি প্রবর্তন করে এবং ইসলামী রাষ্ট্র সরকারকে ধ্বংস করে বল প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের অযোগ্য, নাস্তিক্য, লম্পট পুত্রকে অবৈধভাবে রাজা হিসাবে মনোনয়ন দিয়ে সবাইকে তাকে রাজা হিসাবে জানতে বাধ্য করে এবং আল্লাহ্র নিয়োজিত ও রাসূল (সা.) এর ঘোষিত মুসলমান উম্মাহ্র জন্য নিয়োজিত ইমাম এই জালেম ও অবৈধভাবে নিয়োজিত রাজার বিরুদ্ধে আল্লাহ্ রাব্বুল এর নির্দেশ অনুযায়ী বিদ্রোহ ঘোষণা কররে এই আলেম শ্রণী ইমাম হোসাইন (আ.) কে রাষ্ট্রদোহী তথা ধর্মদ্রোহী বা ফেতনাবাজ আর ফিতনা সৃষ্টি হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ এই যুক্তি জালে তাকে হত্যা করা বৈধ বলে ঘোষণা দিল এবং বাস্তবে হত্যা করেই শান্তি হলো না তার শিরকে করলো। তার দেহের উপর ঘোড়া চালিয়ে মৃতদের প্রতি জঘন্যতম অবমাননা ও ধ্বংস করা ও নবী পরিবারের মহিলাদের শ্রদ্ধা করা ও ও তাদেরকে হাটে বাজারে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, মদীনায় রাসূল (সা.) মাজার শরিফকে ঘোড়ার আ বলে পরিণত করা ও মদীনার পুরনারীদের নির্বিচারে ধর্ষণ ও মক্কার কাবা ঘরে আগুন লাগালেও সেই কাফের, মুনাফেক, মুসলমান কি না এ ব্যপারে বিতর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে বেহেশ্তে পাঠানোর পথ সুগম করতে এ আলেমরা সদা ব্যস্ত ও তার পিতা যে আম্মার ইবনে ইসাসীর (রা.) হযরত ওয়ায়েশ করণীর মত আলেমকে রাসূলসহ প্রায় এক লাখ মুসলমান হত্যার জন্য দায়ি তার এহেন জঘন্য অপকর্মকে এজতেহাদী ভুল বলে পাশ কাটানো বা তাদের বিষয়ে আরোচনা নিষিদ্ধ মর্মে বানানো/জাল হাদিসের মাধ্যমে এসব ধর্মদ্রোহী ব্যক্তির পক্ষে রক্ষা করে চলেছেন।

আমরা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করা হয় সেই তালিকায় যদি নবী-ওলী-দরবেশ, পুন্যাত্মাদের মাজার বা অনুরূপে কোন সত্তা বস্তু/ব্যক্তি না থাকে তাহলে নতুনভাবে ইজমা, ইজতি যাদে নামে এই তারিকায় নতুন কোন বিষয় অন্তভুক্তকরার প্রয়োজন নাই। বিদআত এক নতুন সংযোজন যার মাধ্যমে

বর্তমান সমাজে এক শ্রেণির আলেম এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদআতের পরিচয় কি? কি বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে সর্বসম্মত বক্তব্য/সিদ্ধান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। এ ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে প্রধানত দুটি দলে বিভক্ত হতে দেখি। এক দলের মতে রাসূল (সা.) এরপর ভাল থেকে বা মন্দ হোক, ইবাদত জাতীয় হোক কিংবা পার্থিব রীতিনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন উদ্ভাবিত যে কোন বিষয়কে বিদআত বলে। এ দলের নিকট সকল বিদআত মন্দ নয়, বরং কিছু বিদআত ভাল, আর কিছু বিদআত মন্দ। তারা বিদআতকে ওয়াজিব, হারাম, মুস্তাহাব ও মাকরুহ প্রভৃতি প্রকারেও ভাগ করেছেন। উল্লেখ্য, হালাল এবং হারাম ঘোষনা করার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) ছাড়া অন্য কেহ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়। অথচ মুসরমান জাতি রাসূল (সা.) এর পবিত্র কোরআন ওহাদিসের নির্দেশ বা মূল িসাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অনেক বিধি বিধান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে জালেম রাষ্ট্র নায়কগণ যারা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবেবেতঈন বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিধি বিধান চালু করেছেন আর এক শ্রেণির আলেম রাসূল (সা.) এর পরবর্তী প্রায় দুইশত বছরের কর্মকাণ্ডকে ঢালাওভাবে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়ে আসছেন আর এসব কর্মকাণ্ডকেই স্টান্ডার্ড হিসাবে সর্বজন মান্য হিসাবে এমন কি বল প্রয়োগের মাধ্যমেও প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এর চেয়ে বড় জুলুম আর কি হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনের আলোকে হযরত ও মুহাম্মদ (সা.) এর বৈধ উত্তরাধিকারীকে বা কারা তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, ইসলম ধর্ম কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য পাঠানো হয়েছে। তাই এই ধর্মের শিক্ষা চিরন্তন। এ কারণে এই হেদায়েত আদম সন্তানদের নিকট সব সময় পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন বলে আল্লাহ্ স্বয়ং আদম (আ.) কে পৃথিবীতে পাঠানের পূর্বে ওয়াদা কররেন। কারণ আদম সন্তান যেন কখনও আল্লাহ্র কাছে এ অভিযোগ না করতে পারে যে, হে আমার প্রতিপালক, তোমার পক্ষ থেকে কোন হাদি বা হেদায়েতকারি আমাদের কাছে আসেনি।

এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎ পক্ষের নির্দে অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা বাকারা : ৩৮)। তাই যে সব আলেম, বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিক বলে থাকেন যে, রাসূল (সা.) উম্মতের জন্য কোন উত্তরাধিকারী, ওয়াসী বা প্রতিনিধির কথা ঘোষণা করেন নাই বা এ ব্যাপারে তার কোন সিদ্ধান্ত নাই। বরং তার উম্মত তাদের নিজস্ব ইচ্ছা বা পদ্ধতি অনুযায়ী রাসূল (সা.) এর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত। স্মরণ রাখতে হবে তারা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) এর দুশমন। কারণ তারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে এমন একটি অভিযোগ উপস্থাপন করে যা পবিত্র কোরআনের এই নির্দেশ ও তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম (সূরা মায়েদা : ৩)। এই বক্তব্য ও নিদের্শের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ আর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অবস্থান নিলে সে আর মুসলমান হিসাবে আল্লাহ্র নিকট বিবেচিত হবে কি? যদি কেহ কোন আলমকে প্রশ্ন করেন পবিত্র কোরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত কোনটি? তাহলে তিনি যদি প্রকৃত পক্ষেই একজন কোরআন গবেষক হন তাহলে তিনি বলতে বাধ্য হবেন যে, রাসূলের সকল শিক্ষার সারাংশ যে আয়াতের মধ্যে নিহিত রয়েছে সে আয়াতটি হলো – হে রাসূল (সা.) যা যে আদেশ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দাও, আর যদি তুমি না কর, তবে তুমি (যেন) তার কোন বার্তাই পৌঁছাও নি এবং (তুমি

ভয় কর না) আল্লাহ্ তোমাকে মানুষের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচারিত করেন না (সূরা মায়েদা : ৬৭)।

ইবনে আবী হাতিম ও ইবনে আসাকীর আবু সঈদ খুদবী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াতে গাদীরে খুম প্রান্তরে হযরত আলী (আ.) এর শানে নাযিল হয়েছে। এই কারণে ইবনে মার দুইয়া আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর যুগে আয়াতটি এভাবে পড়তাম হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ এ নির্দেশ যে, আলী সমস্ত মোমিনের নেতা-পৌঁছে দাও, আর তুমি যদি তা না কর, তবে তুমি (যেন) তাঁর (আল্লাহ্র), কোন বার্তাই পৌঁছাওনি (তাফসীর দুররে মানসুর ২য় খণ্ড, পৃ:-২৯৮ মিশর মুদ্রণ)। উল্লেখ্য, রাসূল (সা.) এর যুদে সাহাবাগণ কোরআনকে এর ব্যাখ্যা ও পাঠ করতেন যাতে ভুল ব্যাখ্যার অবকাশ না থাকে। বাস্তব এটাই যে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হযরত আলীকে স্বীয় খলিফা ও স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির বিরোধীতা ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের আশংকায় সকলে সামনে ঘোষণার পদক্ষেপ নিতেন না। অবশষে যখন বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ গুরুত্বসহ এ আদেশ অবতীর্ণ হল, তখন তিনি নিশ্চন্ত হয়ে গাদীরে খুম নামক স্থানে লক্ষাধিক হাজীর সামনে তাঁকে স্বীয় খলিফা ঘোষণা করলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলে তাঁকে তাঁর বেলায়েত ও খেলাফতের জন্য অভিনন্দন জানালেন, কবিগণ কবিতা রচনা করলেন, যেমন প্রখ্যাত কবি হামসান ইবনে সাবিত। তবে তার খেলাপতের ঘোষনা শুনে কিছু সংখ্যক লোক রুষ্ট হলো এবং তাদের একজন মহানবী (সা.) এর নিকট প্রতিবাদ করতে আসল এবং পরিণামে তার উপর বজ্রপাত হল ও যে মৃত্যুবরণ করল। এ বিষয়টিও সূরা মা আরজ এ আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন "এক ব্যক্তি চাহিল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত কাফিরদের জন্য ইহা প্রতিরোধ করার কেই নাই। (সূরা মা আরজ : ১-২) সূরা মাযিদার ৬৭নং আয়াতটি তাবলীগের তথা রাসূল (সা.) আয়াত হিসাবে সুপরিচিত। এই আয়াতটি ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নবুওতের পরবর্তি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে। মহানবী (সা.) জীবনের শেষ দিকে আল্লাহ্তালা অত্যাধিক গুরুত্বসহকারে এই মর্মে আদেশ দেন যে, রাসূল (সা.) এরপর ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী (ইমাম/খলিফা) তথা স্থলাভিষিক্তের নাম ও পরিচয় সকল মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন এবং এ ব্যাপারে মানব জাতির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

মহান আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে রাসূল (সা.) তার মিশনের শেষ দায়িত্ব হিসাবে স্থলাভিষিক্তের নাম ও পরিচিতি তুলে ধরাই এই আয়াতের উদ্দেশ্য। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তালা বিভিন্ন খেতাবে বা পদবীতে রাসূলদের ভূষিত করে আহ্বান করা হয়েছে এবং এগুলো গভীর তাৎপর্যপূর্ণ রাসূল (সা.) কে আল্লাহ্তালা ও হে চাদরাবৃত্ত", "ওহে নবী" ও হে রাসূল (সা.) নামে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সম্বোধন রাসূলের বাহ্যিক অবস্থার ইঙ্গিত করে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ সম্বোধন সরকারি পদ মর্যাদার দিকে নির্দেশ করে পবিত্র কোরআনে অসংখ্যবার "হে নবী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু ওহে রাসূল (সা.) "শুধুমাত্র দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্র প্রশাসনিক বা সরকার ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদবীর মাধ্যমে সম্বোধন করায় রাসূল (সা.) কর্তৃক ঘোষণার বিষয় বস্তু যে মহা গুরুত্বপূর্ণ তাই নির্দেশ করে। হে রাসূল (সা.) যে বিষয়ের উপর বলার জন্য নির্দেশিত হয়েছেন তা পালন করুন এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছে দিন। এই বিশেষ দায়িত্ব হলো আপনার স্থলাভিষিক্ত/ উত্তরাধিকারী/ ওয়াসী/ প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ প্রসঙ্গে। এই দায়িত্ব এতই গুরুত্বপূর্ণ যে যদি তা পালন না করা হয় তাহলে তিনি রেসালতের কোন দায়িত্বই (সূরা আল ইমরানের-১৪৪) পালন করলেন না। তবে একথা সত্য ও পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ রাসূল (সা.) কে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন,

রাসূল (সা.) তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ তা যথাযথভাবে প্রচার ও জনগণকে তা বুজানোও তা প্রতিপালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উক্ত আয়াতের এই কঠোর হুঁশিয়ারী এ কারণে যে মানুষ যাতে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে। যেহেতু এ দায়িত্বটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর এ কারণে এটি ইসলামী ধর্ম ও রাষ্ট্রের সরাসরি মালিকানা/ উত্তরাধিকার বিষয়ক তাই এটি প্রচার করলেই সমাজের এক শ্রণির প্রভাবশালী লোক রাসূল (সা.) বিরুদ্ধাচারণ করতে পারেন ফলে এমনকি তার প্রাণ হানির আশংকাও রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তাঁ রাসূলের পূর্ণ নিরাপত্তার বিষয়টি ঘোষণা করলেন।

গাদীরের ঘটনা প্রবাহ

এই আয়াতটি গাদীরে খুমের ঘটনা প্রবাহ প্রসঙ্গে যেখানে রাসূল (সা.) এর দেয়া বক্তব্য ও আলী (আ.) কে তার পরবর্তী স্থলাভিষিক্ত, উত্তরসুরী, খলিফা, ইমাম হিসাবে পরিচিতি করানোর প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে এরূপ হাদিস ১১০জন মহান সাহাবীর মাধ্যমে ৮৪জন তাবেঈন ও ৩৬০জন নির্ভরযোগ্য মুসলিম চিন্তাবিদ ও গবেষক দলিলসহ বর্ণনা করেছেন এসব নজীরবিহীন ব্যক্তিত্বের বর্ণনা এবং সার্বিকভাবে এই সনদ ও দলিলের দিকে লক্ষ্য করলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, গাদীরের হাদিস একটি কাতঈ (সহীহ ও সুনিশ্চিত) উজ্জল দৃষ্টান্ত ও মোতাওয়াতের হাদীস বলে পরিগণিত এবং কেউ যদি এ হাদিসটাকে যে না মানতে চায় তাহলে সে কোন হাদিসকেই নির্ভরযোগ্য বলে মানতে বা বিশ্বাস করবে না। হাদিস বিশারদদের বর্ণনা অনুযায়ী গাদীরে খুম মক্কা ও মদীনার মাঝে আল হফা নামক স্থান থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। সুনির্দিষ্টভাবে মক্কা থেকে ১৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সেদিন দশম হিজরির ১০ জিলহজ বৃহস্পতিবার, হঠাৎ করে রাসূল (সা.) এর পক্ষ থেকেসবাইকে থেমে গিয়ে এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার আদেশ ঘোষিত হলো। সেখানে না ছিল কোন ছায়ার ব্যবস্থাও না ছিল কোন সবুজ গাছপালা শুধুমাত্র কয়েকটি ডাল ও পাতাবিহীন মরু উদ্যান যেগুলো মরুভূমির উত্তপ্ততার সাথে যুদ্ধকরে টিকে ছিল এ অবস্থায় জোহরের নামাজ শেষ হল। নবী (সা.) এ মর্মে খবর দিলেন যে, সবাই যাতে আল্লাহ্র প্রেরিত এক অতি গুরত্বপূর্ণ সংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুতি নেয়া যা একটি বিস্তারিত বক্তৃতার মাধ্যমেতিনি ব্যক্ত করেছিলেন। এখানে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার লোক উপস্থিত ছিল। তাই রাসূল (সা.) এর পবিত্র মুখমণ্ডল দেখার সুবিধার্থে উটের পিঠের হাওদাগুলো দিয়ে উঁচু স্টেইস তৈরি করা হলো এবং রাসূল (সা.) সেখানে আরোহন করলেন।

রাসূল (সা.) হামদ ও সানা পড়ে নিজেকে আল্লাহ্র কাছে সপে দিলেন অতঃপর উপস্থিত সবাইকে সম্বোধন করে বললেন : আমি অতি শীঘ্রই আল্লাহ্র পাকে সাড়া দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নেব। আমি নিজেও একজন দায়িত্বশীল এবং তোমরা ও তোমাদের ব্যাপারে কিভাবে সাক্ষ্য দিবে। জনগণ উচ্চ স্বরে বলতে লাগল: আমরা সাক্ষ্যি দিচ্ছি আপনি আপনার রেসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন। রাসূল (সা.) বললেন, তোমরা কি আল্লাহ্ একত্ববাদ, আমার নবুয়াত ও কেয়ামতের দিনেমৃত ব্যক্তিদের জীবিত হওয়ার সেই সত্য কথার সাক্ষী প্রদান করবে না। সকলেই বলরেন, হ্যাঁ সাক্ষ্য দিচ্ছি রাসূল (সা.) বললেন, এখন লক্ষ্য করো আমি যে দুটি মূল্যবান জিনিস তোমাদের মধ্যে রেখে যাচ্ছি তার সাথে কিভাবে আচরণ করবে। উপস্থিত লোকজনদের একজন বলে উঠল, ওহে রাসূলুল্লাহ্ সে মূল্যবান জিনিস দুটি কি? রাসূল (সা.) বললেন, প্রথমটি আল্লাহ্র কিতাব, যার এক প্রান্ত আল্লাহ্র হাতে ও অন্য প্রান্ত তোমাদের হাতে, সেখান থেকে হাত তুলে নিয়ো তাহলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু দ্বিতীয় যে বস্তুটি আমার কাছে অত্রন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহলো আমার বংশধারা এং আল্লাহ্ আমাকে এই মর্মে খবর দিয়েছেন যে, এ দুটি জিনিস কখনোই একে

অপর থেকে আলাদা হবে না যে পর্যন্ত বেহেশ্‌তে এসে আমার সাথে মিলিত না হবে, এদুটো থেকে অগ্রবর্তী হয়োনা তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পিছু হটোনা তাহলেও ধ্বঙস হয়ে যাবে।
হঠাৎ লোকজন দেখতে পেল যে, রাসূল (সা.) তার চারপাশে থাকে যেন খুঁজছেন এবং আলী (আ.) এর উপর চোখ পড়া মাত্রই নীচু হয়ে তার হাত ধরে উপরে উঠালেন। উপস্থিত সবাই তাকে দেখতে ও চিনতে পারল যে তিনি মহানবীর ইসলামের সৈনিক আলী (আ.) এ সময় রাসূলের কণ্ঠ আরো সুস্পষ্ট ও বৃদ্ধি পেল এবং তিনি বললেন, মুসলমানদের মধ্যে তোমাদের টেয়ে কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম। সবাই বললো, আল্লাহ্ ও তার রাসূল (সা.)। নবী (সা.) বলরেন, আল্লাহ্ আমার মওলা ও নেতা এবং আমি মুমিনদের মওলা ও নেতা (ইসম) এবং তাদের উপর তাদের নিজেদের চেয়েও অগ্রাধিকার রাখি। অতঃপর বললেন, !আমি যার মওলা ও নেতা (ধর্মকর্ম) আলীও তার মওলা নেতা্ এই বাক্যটি তিনবার এবং কারো কারামতে চারবার পুনরাবৃত্তি করলেন। অতঃপর আমাদের দিকে দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ্ যে, তার বন্ধু হয়, তুমি তার বন্ধু হও এবং যে তার শত্রু হয় তুমি তার শত্রু হও, যে তাকে ভালবাসে তুমিতাকে ভালবাসে। যে তার সাথে হিংসা কর তুমি তার সাথে হিংসা করো। যে তাকে সাহায্য করে তুমি তাকে সাহায্য করো, যে তাকে অপদেস্থ করে, তুমি তাকে অপদস্থ করো। সত্যকে তার সাথী করো ও সত্যকে তার থেকে পৃথক করোনা। অতঃপর বললেন, জেনে রেখো, তোমাদের সকলের কতর্ব্য হলো যারা এখানে উপস্থিত নাই তাদেরকে এ খবর পৌঁছে দিবে। এভাবে রাসূল (সা.) এর প্রদত্ত খোতবা সমাপ্ত হলো, রাসূল (সা.) ও আলী (আ.) এর মাথা বেয়ে ঘাম ঝড়ছিল তখনো লোকজন ঐ স্থান ছেড়ে চরে যায় নি এমন সময় আল্লাহ্ দূত জিব্রাইল (আ.) প্রেরিত হলেন এব এই আয়াতটি তেলওয়াত করলেন, আজ তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম। তখন রাসূল (সা.) বললেন, আল্লাহ্ মহান, আল্লাহ্ মহান, তিনি তার দ্বীনকে পূর্ণ করলেন, এবং আমার নবুওত ও রেসালতের এবং আমীর আলীর বেলায়াত ও খেলাফতের উপর সন্তুষ্ট হলেন। এমতাবস্থায় মানুষের মাঝে শোরগোল শুরু হল এবং আলী (আ.) কে সবাই মোবারকবাদ জানালেন, সুপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা তাকে সম্বর্ধনা জানালো তারা হলেন আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) তারা উপস্থিত জনতার মাঝে বলতে লাগলেন। বাহবা, বাহবা ওহে আবু তালিবের পুত্র, তুমি আমার ও সমগ্র মুমিন মুমিনদের মওলানা ও ইমাম নেতা হয়ে গেলেন। এ সময় ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহ্‌র কসম এই প্রতিজ্ঞা (নির্দেশনা) সকলের ঘাড়েই বয়ে গেলে (বাধ্যতামূলক হয়ে গেল) এবং হাসসা ইবনে সাবেত বিখ্যাত কবি রাসূল (সা.) এর অনুমতি নিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন: অর্থ: তাদের নবী সেদিন গাদীর দিবসে খোদা প্রান্তরে তাদেরকে আহ্বান জানালেন এবং কতইনা মহান। বললেন, তোমাদের মওলা ও নবী কে? তারা সংকোচ ব্যতিরেকেই বলে উঠলো আল্লাহ্ আমাদের মওলা এং আপনি আমাদের নবী এবং আমরা আপনার বেলায়েত মেনে নিতে কখনো অবাধ্য হবোনা; তিনি আলীকে বলরেন, উঠে দাঁড়াও কারণ আমি তোমাকে আমার পর ইমাম ও রাহবার নির্বাচন করলাম। অতঃপর বললেন, আমি যার মওলা ও নেতা এই আলী তার মাওলা ও নেতা অতএব তোমরা সবাই তার সততার উপর অনুসরণ কর। এ সময় নবী (সা.) বললেন, হে আল্লাহ্ তার বন্দুকে ভালবাস এবং তার শত্রুর সাথে শত্রুতা করো। এই কবিতার মাধ্যমে বর্ণিত হাদিসটি ব্যাপক ও বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত। এর মধ্যে হাফেজ নঈম ইস্মাহানী, হাফেজ আবু সাঈদ সাজেস্তানী, খারাজম মালেকী, হাফেজ আবু আবদিল্লাহ মারজাবানি, পাঞ্জে শাহ শাফেঈ, জালাল উদ্দিন সুয়ুতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ইমাম-ইসামত-খলিফা-খিলাপত একটি পর্যালোচনা

আমরা ইতোপূর্বে পবিত্র কোরআনের বর্ণনার বরাতে উল্লেখ করেছি ইমাম পদবীটি সংরক্ষিত। অর্থাৎ নবী-রাসূলদের কারো কারো ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্তালা ইমাম পদবীতে ভূষিত করেছেন। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ইমাম পদবীতে উল্লেখ করেছেন। রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর তার উত্তরাধিকারী হিসাবে ইমাম ও খলিপা এই দুটি শব্দ দুটি রাজনৈতিক মতবাদ এবং এর ভিত্তিতে দুটি প্রধান দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই রাজনৈতিক বিভাজ মূলত হযরত আলী (আ.) এর সময় থেকে ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং হযরত আলী (আ.) এর শাহাদাতের পর (৬৫১) রাসূলের ও আহলে বাইতের বংশানুক্রমিক দুশমন বনি উমাইয়া বংশ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বে অধিকারী হয়ে এই রাজনৈতিক বিভাজনকে পৃথক ধর্মীয় মতবাদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। উল্লেখ্য, গাদীরে খুমের ঘোষণার পর হযরত আলী (আ.) তদানীন্তন মুসলিম সমাজে ইমাম হিসাবে বরিত হন এবং সবাই ধারণা করে যে রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর হযরত আলী (আ.) ইমাম পদবী ধারণ করে ক্ষমতাসীন হবেন। আর এই ইমাম মতের ধারা ইসলামের আদর্শ রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী ও ক্ষমতাসীন হওয়ার একমাত্র ধর্ম-রাজনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয়।

নব-রাসূলের পর রাসূলের উত্তরাধিকারী হিসাবে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত-হে আমানুগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করো তবে তোমরা অনুগত্য কর আল্লাহ্র আনুগত্য কর আল্লাহ্র রাসূলের ও (অনুরূপভাবে নিয়োজিত) উলিল আমরদের খোদায়ী কর্মকর্তাদের তথা ক্ষমতাসীনদের। (সূরা নিসা-৫১)। এই আয়াত নাযিল হলে হযরত যাবর ইবনে আব্দুল্লাহ্ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, যখন উক্ত আয়াত নাযিল হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমরা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলকে চিনেছি এবং উলিল আমর যার অনুসরণকে আল্লাহ্ নিজের ও পয়গম্বরের অনুসরণ বলে ঘোষণা করেছেন তারা কারা? দয়া করে তাদের নাম বলেদিন। মহানবী (সা.) উত্তরে বললেন, তাঁরা আমার স্থলাভিষিক্ত এবং আমার পরে তোমাদের ইমাম, তাদের প্রথম হচ্ছেন হযরত আলী বিন আবু তালিব তারপর আমি হোসাইন ইবনে আলী সাইয়েদুল শুহাদা তারপর আলী ইবনে আল হোসাইন জয়নাল আবেদীন তাঁরপর মোহাম্মদ ইবনে আলী আল বাকের যিনি বাকের নামে প্রসিদ্ধ। হে যাবির! তুমিতাঁর দেখা পাবে যখন তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবে তখন তাকে আমার সালাম পৌঁছে দিও। তাঁরপর জাফর ইবনে মোহাম্মদ আস সাদিক তারপর মুসা ইবনে জাফর আল কাজীম তারপর আলী ইবনে মুসা আল রেজা, তারপর মোহাম্মদ ইবনে আলী জওয়াদ (আততাকী), তারপর আলী ইবনে মোহাম্মদ আল হাদী (আল নাকী) তাঁর পর আল হাসান ইবনে আলী আল আসকারী। তার পর আমার নাম এবং উপাধি বহনকারী যে জগতে আল্লাহ্র প্রমাণ এবং আল্লাহ্র অস্তিত্বের মানবের মধ্যে চিহ্ন বহন করবে। আল্লাহ্তালার মাধ্যমে পৃথিবীর পূর্ব পশ্চিম জয় করে দিবেন।... যার শুভ নাম হবে মোহাম্মদ আল মেহেদী। সূত্র ইয়ানাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃ. ৪২৭ (বৈরুত) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল বলেন, আমি নবীদের প্রধান এবং আলী ইবনে আবিতালেব উত্তরসুরীদের প্রধান আর আমার পর উত্তরসুরীর সংখ্যা হবে বারো। যাদের প্রথম ব্যক্তি হচ্ছে হযরত আলী এবং শেষ ব্যক্তি হচ্ছে ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম। (সূত্রঃ তাজকিরাত আল হুককাজ, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা-২৯৮)। আল দুরাল আলি কামেরা (ইবনে হাজার আসফালীনী খণ্ড-১-পৃ-৬৭)।

প্রসিদ্ধ আহলে সুন্নাত আল জামাত পন্থী পণ্ডিত, মুফতিয়ে আযম শেখ সুলায়মান কান্দুজী হানাফি, তুর্কি, তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ইয়ানাবিউল সুয়াদ্ধাতে বর্ণনা করেছেন যে, নাছাল নামক একজন ইয়াহুদি মহানী (সা.) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া মুহাম্মদ (সা.) কয়েকটি প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই? যা কিছুদিন থেকে আমার মানসপটে আন্দোলিত হচ্ছে। যদি আপনি এর সটিক উত্তর আমাকে প্রদান করেন। তাহলে আমি আপনার হাতে ইসলামগ্রহণ করবো। মহানবী (সা.) বললেন, হে আবু আম্মারা তুমি প্রশ্ন করে

যাও কোন অসুবিধা নাই। ঐ ব্যক্তি কয়েকটি প্রশ্ন করলো এবং প্রতিবারই বললো আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন বলে সম্মতি প্রকাশ করলো। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো আমাকে বলে দিন আপনার পর কে আপনার উত্তরসুরী হবে? কেন না, কোন নবীই উত্তরসুরী না রেখে বা ঘোষণা না দিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেন নি। আমাদের নবী মুসা (আ.) বলে গেছেন, তাঁর অবতমানের হযরত ইউসা বিন নুন হলেন তার উত্তরসুরী নবী (সা.) ইহুদী লোকটির উত্তরে বললেন, আমার পর আমার উত্তরাধিকারী বা উত্তরসুরী হচ্ছে আমার ভাই আলী ইবনে আবু তালেব তারপর আমার দুই সন্তান হাসান ও হোসাইন অতঃপর অবশিষ্ট নয়জন হবেন ইমাম হোসাইন এর বংশ থেকে আগমন করবেন। লোকটি বলল, ইয়া মুহাম্মদ (সা.) দয়া করে বাকীদের নাম বলেদিন। নবী (সা.) বললেন, হোসাইনের পরলোক গমনের পর তার পুত্র জয়নুল আবেদিন হবে, তার তিরোধানের পর স্বীয় পুত্র মোহাম্মদ বাকের হবে। তার ইন্তেকালের পর তদীয় পুত্র জাফর সাদেক হবে। আর জাফর সাদেকের তিরোধানের পর তদীয় পুত্র মুসা কাজেম হবে। তাঁর ইহলোক ত্যাগের পর তদীয় পুত্র আলী রেজা হবে। তার তিরোধানের পর তদীয় পুত্র মুহাম্মদ তাকি হবে। তাঁর অন্তর্ধানের পর তদীয় পুত্র আলী নকী হবে। তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র হাসান আসকারী হবে। তাঁর তিরোধানের পর তদীয় পুত্র ইমাম মাহদী (আ.) পর্যায়ক্রমে ইমাম হবেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র হুজ্জাত বা জমিনের বুকে অকাট্য দলিল। পরক্ষণে ইহুদী লোকটি ইসলাম গ্রহণ করলো। সূত্রঃ ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত পৃ. ৪৪, (বৈরুত), উর্দুতরজমা পৃ-৬৯১-৬৯৪, লাহোর)।

গাউসুল আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর গ্রন্থের ১২ ইমামের বর্ণনা

নবী (সা.) ইমাম হোসেনের সৃষ্ট দেশে শীতল হস্ত বুলাতে লাগলেন এবং তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার নয়ন মনি ন্যায় ও সত্যের মূর্তপ্রতীক শেরে খোদা আলীর সুযোগ্য এবং মর্যাদার অধিকারী পুত্র ধর। আল্লাহ্‌পাক তোমার ন্যয় পরায়ণতা ও সত্যনিষ্ঠপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। এটারই বদৌলতে ভবিষ্যতে তোমার বংশে নব রত্নের আবির্ভাব ঘটবে। তাদের প্রত্যেক হবে এক একজন ইমাম। তাদের সত্যনিষ্ঠা ন্যায় নীতির জন্য আবহমানকাল থেকে এই নশ্বর পৃথিবী গর্ব অনুভব করবে এবং তাঁদের কীর্তি গাথাঁর পা গাইতে থাকবে। হে আমার বংশের পদীপ তোমার দ্বারাই আমার বংশের সূত্র ধরিত্রীর বুকে টিকে থাকবে। তুমি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে তাঁদের নাম স্মরণ রেখো (মূল হাদিস ৪ ক্রমিক থেকে শুরু)। তাঁরা হলেন-১. আলী বিন আবিতালিব, ২. হাসান বিন আলী, ৩. হোসাইন বিন আলী, হযরত জয়নুল আবেদীন, ৫. হযরত ইমাম বাকের, ৬. ইমাম জাফর সাদেক, ৭. হযরত মুসা কাজেম, ৮. হযরত আলী রেজা, (৯) হযরত তকী, (১০) হযরত নবী, ১১. হযরত হাসান আসকারী, ১২. হযরত ইমাম মেহেদী (আ.)। সূত্রঃ গুনিয়অতুত্ব তালেবীন, পৃ.-৩৮০, (তাজকেরাতুল)।

আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূল (সা.) এই ধরণের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও হেদায়েত যা পবিত্র কোরআনের ঘোষণা "আর আপনার রব যা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করে এতে জনগণের কোন সক্ষমতা নেই (কাসাস-৬৮) এবং "তাহাদিগকে করিয়াছিলাম ইমাম তাহারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করত। (সূরা আম্বিয়া :৭৩)।

পবিত্র কোরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহে ব্যাখ্যা করে আহলে সুন্নতের প্রসিদ্ধ আলেম মওলানা হোসাইন আহম্মদ মাদানী সাহেবের ব্যাখ্যা করে আহলে মুন্নতের প্রসিদ্ধ আলেক মওলানা হোসাইন আহম্মদ মাদানী সাহেবের পীর শায়খুল হিন্দ আল্‌রামা মাহমুদুল হাসান হেদলবীর মতে বর্ণিত যে, আল্লাহ্‌তালা যাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাকে কোন খাস পদে বা গুরুত্বপূর্ণ পদে মনোনীত বা নিয়োগ করেন, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য

কারও নিযুক্ত করার কোন অধিকার নাই, (সূত্র আল কোরআন অনুবাদ, সায়খুল হিন্দ, পৃ.-৫০৯)। আল্লামা কাজী বায়ওয়াজী উক্ত আয়াতের বর্ণনায় লিখেছেন যে এটা সঠিক ন্যায় ও সত্য বলে প্রকাশ পায় যে, জন সাধারণের খলিফা ইমাম নির্বাচনের কোনই অধিকার নাই। সূত্র, তাফসীরে আনচারোল তানজীল, পৃ.-৩৩৪)।

আল্লামা হোসাইন ওয়ায়েম কাশাফী লিখেছেন যে, পয়গম্বর ইসলামের খলিফায় স্থলাবর্ত বা প্রতিনিধি নির্ধারণ করার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ হস্তে রেখেছেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সেই পদের জন্য নিজেই মনোয়ন করেন তাতে অন্যের (জনসাধারণের) কোই অধিকার নাই। সূত্র তাফসীরে হুসাইনী খণ্ড-২, ১২৬ উর্দু)। উল্লিখিত প্রসিদ্ধ আলেমগণের বর্ণনা হতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.) এর প্রতিনিধি নির্ধারণ বা মনোনয়ন করার অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাই এবং স্বয়ং নবী (সা.) এর ও ক্ষমতা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ নির্দেশ না দেন। অথচ মুসলিমদের মহা দুর্ভাগ্য যে তারা আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল তিনি প্রকাশ্যে লক্ষাধিক লোকের উপশিতিতে তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উত্তরাধীকারী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা সত্ত্বেও একশ্রেণীর আলেম, বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিক তা গোপন বা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী এক নতুন ধরণের নেতৃত্ব সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূল (সা.) কর্তৃক ঘোষিত মুসলিমানদের নেতৃত্বের ধারা বা প্রকৃতি তথা ইমামতের কনসেপ্টই বাতিল বলে ঘোষণা করলে এবং এর নাম দিলেন খেলাফত এবং প্রচার করলেন এই খেলাফত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারাই ক্ষমতাপ্রাপ্ত এ ব ব্যাপারে আল্লাহ্র কোন সম্পর্ক নাই। মানবীয় নেতৃত্বের ধারাবাহিকতায় ২৫ বছর পর যখন মসজিদে নবীতে প্রকাশ্যগণ ভোটে হযরত আলী যখন (ইমাম নয়) খলিফা হিসাবে নিয়োজিত হলেন ততদিনে আল্লাহ্ রাসূল কর্তৃক প্রস্তাবিত ইমাম ও ইমাম এর প্রতিষ্ঠান মুসলিম সমাজ প্রত্যাখ্যান করে ফেলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এক ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠী আলী (আ.) এর সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতর্ণি হয় এবং তিন তিনটি ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ সংঘটিত করে উটের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ ও খারেজীদের সাথে যুদ্ধ এসব যুদ্ধে লক্ষাধিক লোক নিহত হয়। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। সিফফিরে যুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে এক ধরণের বিজয়ের পর থেকে (৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ) অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী উমরাইয়া নেতা রাজা হয়ে বসে। (৬৬১ খ্রিস্টাব্দ)

এই উমাইয়া রাজা হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে এই অভিসম্পাত চালু করে- " হে আল্লাহ্! আমার প্রতি তোমার লানত বর্ষণ কর, কারণ সে তোমার দ্বীনকে অস্বীকার করেছে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাকে জাহান্নামের সুকঠিন শাস্তি প্রদান কর।" (আল নাসাই আল কাফিয়াহ, পৃ.-৭২, তিনি আল রামাদ আল ইমামবাহ কিতাব থেকে উম্মান থেকে বর্ণণা করেছেন। এই অভিসম্পাত রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। এই প্রজ্ঞাপন জারীর পর রাষ্ট্রীয়ভাবে সকল সভা সমাবেশে ইবাদতের স্থান থেকে এবং মুসলিম ভূখণ্ডের সকল মসজিদে মিম্বর থেকে সকল বক্তারা একযোগে হযরত আলীর (আ.) এর প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। আল্লাহ্ ও তার রাসূলের ও ইসলামের দুশমন মারোয়ান বিন হাকাম মদীনার গভর্ণর হিসাবে হযরত আলী (আ.) এর প্রতি অমর্যাকর ও গালি গালাজ সম্পন্ন বক্তব্য প্রদানের এত বেশি সক্রিয় ছিল যে, তার এরূপ জঘন্য কাজে বিরক্ত হয়ে হযরত ইমাম হাসান (আ.) মসজিদে যাওয়া পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ানুরূপভাবে আল মুগিরা বিন শুরা ও একাজে অম্রগণ্য ছিল। গভর্ণর মিয়াদ যে সমস্ত লোক এ ধরণের অভিসম্পাত সম্মত হতো না তাদের সে নির্মমভাবে হত্যা করত। আব্দুল মালেক বিন মারোওয়ান এর শাসনকালে (৬৮৬-৭০৫ খ্রিস্টাব্দ)। তখন সে হযরত আলী (আ.) প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণকে তার প্রধান ধর্মীয় কাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। উমাইয়া খিলাফতের একজন গভর্ণর খলিফা বিন আব্দুল্লাহ্ আল কাসিরে হযরত ইমাম আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি লানত ও গালি গালাজ করত। সে

মিম্বরে বসে বলতো নবীর জামাতা, আলী ইবনে আবু তালিবের প্রতি খোদার লানত, তার কন্যার স্বামী, আল হাসান ও আল হোসাইনের পিতার প্রতি খোদার লানত বর্ষিত হোক, ঐতিহাসিক আ?ল সুয়ুতি লিখেছেন উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খ্রিস্টাব্দে) প্রায় সত্তর হাজার দশটি মসজিদের মিম্বর থেকে হযরত আলীর প্রতি নিয়মিতভাবে লালত বর্ষণ একটি ধর্শীয় সুন্নত হিসাবে পরিণত হয়েছিল।

আমাদের জাতীয় সুফি কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও উমাইয়া কুশাসনের বিষয়টি তাঁর মহরম কবিতায় উল্লেখ করেছেন। এই ধুত ও ভোগীরাই (উমাইয়া রাজন্যবর্গ) তলোয়ার বেধে কোরআন আলীর করেছে সদাই বিব্রত পেরেশান এই এজীদের সেনাদল শয়তানের প্ররোচনায় হাসান হোসেনে গালি দিতে যেত মক্কা ও মদীনায় এরাই আত্ম প্রতিষ্ঠা লোভে মসজিদে মসজিদে বক্তৃতা দিয়ে মান্যতা ঈষা হায় স্বজাতির হৃদে। (নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন মে ১৯৮২)।

যখন সাধারণ জনগণ ও নীচু প্রকৃতির লোকেরা বুঝতে পারেলা যে সময় আলী তথা আহলে বাইতদের গালি গালাজ করা উমাইয়াদের নিকট অত্যন্ত প্রিয় এর মাধ্যমে রাজা অনুগ্রহ পাওয়া যায় তখন তারা খেলাফতের দরকারে গিয়ে এর মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করত। আরবের সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে এই ধারণা ও বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, নবী পরিবারের প্রতি অভিসম্পাদত তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের সহায়ক। তারা দেখল যে, শুধু নবি পরিবারের প্রতি কুৎসা রটনা করেই উমাইয়াদের থেকে যা পাওয়া সম্ভব যা আর কোন সেবার দ্বারা সম্ভব নয়। এই জঘন্য ধর্মদ্রোহিতা খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযিযের আমলে সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েচিল। তখন জনগণ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে দাবি করেছিল যে ওমর বিন আব্দুল আযিয সুন্নত তরক করছেন এই মহান খলিফার শাহাদতের পর এই জঘন্য প্রথা পুনরায় চালু করা হয় এবয় উমাইয়া শাসনের শেষ দিন (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত অব্যহত ছিল। (তথ্য সূত্র ইমাম হাসান ও খেলাফত ইতিহাসের অব্যক্ত অধ্যায়। মোস্তফা কামাল প্রকাশকাল ২০১৪)।

আব্বাসীয় খলিফারা আহলে বায়তের নামে ক্ষমতা দখল করলেও আহলে বাইতের সদস্যদের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে উমাইয়া নীতি অনুসরণ করতে থাকে। ইমাম আলী (আ.) তথা আহলে বাইতের সদস্য, ভক্ত ও অনুসারীদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন, সম্পত্তি বায়েযাপ্ত করণ, হত্যা, গুম, খুন, বিচারের নামে প্রহসনসহ সকল পন্থায় হেয় প্রতিপন্ন করে উমাইয়া আব্বাসীয়রা তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ধর্ম ত্যাগী-রাফেজী, শিয়া নামে নতুন এক ধর্মমত সৃষ্টি করে। মোটামুটিভাবে যারা রাজ শক্তির অনুগত, ভক্ত, অনুসারী তারাই হলো আল্লাহ্‌র রাসূলের নামে মহাত্ম বর্ণনা করে তার সাহাবাদের মর্যাদা বেশি এবং তারাই খিলাফতপন্থী আর এরাই ইসলাম ধর্মের প্রধান স্রোতধারা (Mainstream) আহলে সুন্নাত আল জামাত। আর অন্যদল হলো ইমামত আহলে বাইত আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী তারাই প্রকৃত ধর্ম ও রাজনীতির নেতৃস্থানীয় বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তারাই শিয়া-ধ্বংস বাকেজী, ধর্মদ্রোহী খোদাদ্রোহী তাই সকল অর্বন চেষ্টা মূল। তাই তাদের ধ্বংস করা জায়েজ।

এই ধর্ম-রাজনৈতিক (Reliso-Political) বিভাজন যে আল্লাহ্ রাসূল ও আহলে বাইতের দুশমন শাসকদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার ফসল যা তাদের অনুসারী, বংশবাদ কথা নিয়ন্ত্রণাধীন উলামা সমাজ কর্তৃক প্রচারিত ও বিকশিত এবং জালেম শাসকদের অর্থবল অস্ত্রবল শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত। আর এটি একটি জঘন্য ধর্মীয় তথা কোরআন ও রাসূল (সা.) এর সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। রাষ্ট্র ধর্মীয় মিথ্যাচার। সত্য অনুসরণ ও সত্য গোপন করা যে একটি জঘণ্য অপরাধ সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা :

১. যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে অতঃপর যা উত্তম তার অনুসরণ করে এটাই তারা যাদের আল্লাহ্ হেদায়েত করেছেন তারাই বুদ্ধিমান (সুরা যুমার : ১৮)।

২. তবে যিনি সত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যে অধিক হকদার না যাকে পথ না দেখাইলে পথ পায় না। সে তাই তোমাদের কি হলো? তোমরা একভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (সূরা ইউনুস : ৩৫)।
৩. আপনার রব এর কসম! তারা কখনও মোমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না তারা নিজেদের ঝগড়া বিবাদে আপনাকে (রাসূলকে) বিচারক না মানবে? শুধু এই নয় বরং যা আপনি ফয়সালা করেন তাকে মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। (সূরা নিসা : ৬৫)।
৪. আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে (সূরা বাকারা : ৩৫)।
৫. কোন মোমেন মোমেনার এই অধিকার নাই যে আল্লাহ্ আল্লাহ্ ও তার রাসূল যখন কোন কাজের হুকুম দেয়। যে এ ব্যাপারে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কেহ আল্লাহ্ ও তার রাসূলের হুকুম অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে (সূরা আহযাব : ৩৬)।
৬. অভিশপ্ত হোক মিথ্যাচারীরা যারা ভুলের মধ্যে উদাসীন রয়েছে (সূরা যারিয়াত: ১০-১২)।
৭. হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্কে যেমন ভয় করা উচিত তেমনিভাবে ভয় করতে থাক এবং অবশ্যই প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা (আল ইমরান : ১০২)।
৮, তারাই প্রকৃত মোমিন যারা আল্লাহ্ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না। (হুজ্জরাত : ১৫)।
৯. আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও হেদায়েত মানুষের জন্য নাযিল করেছি। কিতাবে তা বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন করে তাদেরকে আল্লাহ্ অভিসম্পাত দেন এবং অন্যান্য অভিসম্পাত কারীরাও তাদেরকে অভিসম্পাত দেয় (সূরা বাকারা : ১৫৯)।
১০. তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন করো না (সূরা বাকারা : ৪২)।
১১. হে মোমিনগণ তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন, আর সেথায় সে স্থায়ী হবে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা দায়ক শাস্তি (সূরা নিসা : ১৪)।
পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ১২টি ও অনুরূপ আয়াতের আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ- হেদায়েতের মর্মানুযায়ী আমরা সমস্ত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনায় জানা যায় যে, ৬৬১-১২৫৮ সালের জালেম শাহীর রাজত্বের মাধ্যমে আল্লাহ্তালা ও তার রাসূলের দ্বীন ইসলাম তথা ধর্মরাজনীতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হয় তা মুসরিম বুদ্ধিজীবীরা সযত্নে গোপন করে ইসলামের বিরাট উপকার করছেন বলে আত্ম প্রসাদ লাভ করছেন। এর বিপরীতে আল্লাহ্র নির্দেশ অনুায়ী প্রকৃত সত্য ঔপস্থাপন করাই আমাদের ধর্মীয় দায়িকব ও কর্তব্য হিসাবে আমরা এই লেখার অবতারণা করেছি। যা হোক, রাসূল (সা.) এর আমলের প্রকৃত ইসলামের অবসান ঘটিয়ে এই অবৈধ ক্ষমতা দখলদার রাজা-বাদশাহ্রা আমীর উল মোমেনীন পদবী ধারণ করে যা কায়েম করলেন সংক্ষিপ্ত প্রকারে তা হলো: রাষ্ট্র প্রধান নিয়োগের পদ্ধতির পরিবর্তন বা অবসান। আমরা জানি যে, রাসূল (সা.) মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র প্রধানদের নিয়োগের যে বিধান আল্লাহ্র নির্দেশ দিয়েছিলেন তা ছিল আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় THEOERACY ঐশীতন্ত্র-ধর্মতন্ত্র-ধর্মরাজ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান আল্লাহ্র কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি হবেন। যিনি ঐশীগ্রন্থের আলোকে প্রশাসনিক ও ধর্মীয় কাজ নির্বাহ করবেন। এই নিয়োগ জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন থাকা বাধ্যতামূলক নয়। তবে একটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, রাষ্ট্র প্রধান প্রকৃত পক্ষেই আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত কিনা। এই বিষয়টি জনগণের কাছে নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের উত্তরাধিকার

তথা পরবর্তী রাষ্ট্র প্রধান ইসাম/খলিফার সঠিক পরিবর্তিত আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত নবী-রাসূল-উলিল আমর স্বয়ং ঘোষণা করবেন। রাসূল (সা.) এর পর রাষ্ট্র প্রধানের নিয়োগের ঐশী নির্দেশনা/পদ্ধতি পরিত্যাক্ত হয়। রাষ্ট্র প্রধান / খলিপার জীবন যাত্রার বিকৃতি ও পরিবর্তন, নব্য শাসকগণ মহানবী (সা.) ও চার খলিফার জীবনধারা বাতিল করে তারা রাজ প্রাসাদে বসবাস করতে শুরু করে। রাজকীয় দেহরক্ষী বাহিনী তাদের সুরক্ষায় নিয়োজিত হয়। এই দেহরক্ষী বাহিনীর কর্মকর্তাদের অনুমোদন ব্যতীত কোন ব্যক্তি রাষ্ট্র প্রধানের সাথে সাক্ষাতের অধিকার হারায়। বায়তুল মালের মালিকানার প্রকৃতি পরিবর্তন। বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার সম্পর্কে কোরআনী নীতি এই যে, তা রাষ্ট্র প্রধান এবং তার সরকারের নিকট আল্লাহ্ এবং জনগণের আমানত। এতে কারো ইচ্ছা মতো ব্যবহারের অধিকার নাই। রাজতন্ত্র চালু হওয়ায় এই নীতি বিসর্জন দিয়ে বায়তুল মালের মালিকানা রাজা, তার বেগম ও রাজ বংশের অধীন হয়ে পড়ে প্রজারা পরিণত হয় নিছক করদাতার সরকারের হিসাবে বা জবাবদিহিতা থেকে রাজারা স্বাধীন বলে মনে করেন এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তা প্রতিষ্ঠা করে।

মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণ

পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ এই নীতি প্রতি পালন করা একটি রাষ্ট্রীয় ফরজ অর্থাৎ Statutory Responsibility of the State রাজারা এই নীতি প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেন, যে, "আমাকে আল্লাহ্র ভয় দেখাবে তার শিরচ্ছেদকরা আমার জন্য বৈধ।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ

রাজতন্ত্রের ক্ষমতায়নের পর যে সব ব্যাপারে বাদশাদের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত থাকত সেসব ক্ষেত্রে সুবিচার করার অধিকার থেকে কাযীদের বঞ্চিত করা হয়। এমনকি শাহযাদা,গভর্ণর, রাজ প্রাসাদের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও সুবিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

সূরা বা আলোচনা ভিত্তিক সরকারের অবসান

ইসলামের মূলনীতি হলো রাষ্ট্র পরিচালনায় যাদের তত্ত্বজ্ঞান, তাকওয়া, বিশ্বস্ততা এবং নির্ভুল ও ন্যায় নিষ্ঠ মতামতের উপর জনগণের আস্থা রয়েছে। রাজতন্ত্রের আগমনে এই নীতি পরিত্যক্ত হয়। সামরিক এক নায়কতন্ত্র শুরুার স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ গভর্ণর, সেনাপতি, বংশীয় আমীর-ওমরাও দরবারের সভাক্রদগণই ছিলেন রাজার পরামর্শদাতা।

বংশীয় এবং অতি উগ্র আরব জাতিভিমান

এটি একটি কোরআন বিরোধী রাজনৈতিক চেতনা, আরব মুসলমানদের সাথে অনারব মুসলমানদের সমান অধিকারের ধারণা রাজতন্ত্রের যুগে পরিত্যাজ্য বিবেনা করা হয়। ফরে অনাবিদের মনে এ ধারণা প্রবল হয় যে, ইসলামের বিজয় তাদেরকে আরবদের গোলাম পরিণত করেছে। এরই ধাাবাহিকতা অনারবদের ভাষা সাহিত্য সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে বিশেষ অনৈসলামিক, শিকরা বেদআত ঘোষণা করে একটি ধর্শীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

রাষ্ট্র পরিচালনায় আল্লাহ্র আইনের সার্বভৌমত্বের অবসান

জালেম রাজারা দৃশ্যত আল্লাহ্‌র কি তার ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র আইনগত মর্যাদা স্বীকার করত। তবে প্রকৃত পক্ষে এস রাষ্ট্র প্রধানগণের সকল রাজনীতির কর্মকাণ্ড ধর্মের অনুবর্তী ছিল না। অর্থাৎ রাজনীতি ধর্মনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। ধর্মনীতি রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত না। তাই বৈধ-অবৈধ সকল পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের দাবি মিটানো হতো। এ ব্যাপারে হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যা, দয়া-নিষ্ঠুরতা এর কোন তোয়াক্কা করা হতো না। রাজা-বাদশাহ্‌ থেকে যে কোন পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তার ইচ্ছা বা হুকুম হিসাবে প্রতিপালিত হতো। সরকারী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অব্যহতি। শুধুমাত্র ক্ষমতাসীনদের বিরোধীতা ছাড়া অন্য কোন অন্যায় কাজ করলে রাজকর্ম চারীগণকে সাধারণভাবে কোন শাস্তি দেওয়া হতো না।

ধর্মীয় বিশ্বাসগত বা আক্বীদা ও আমল বিষয়ক বিকৃতি

আল্লাহ্‌ ও রাসূল (সা.) এর ঘোষণা অনুযায়ী ইসলাম ধর্মের ধারক ও বাহক হলেন আহলে বাইত এ রাসূল (সা.)। এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল (সা.) ঘোষণা করেন, "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু কোরআন ও আমার আহলে বাইত রেখে যাচ্ছি, তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারাই মুক্তি পাবে। রাজতন্ত্রের যুগে প্রায় ছয়শত বছর যাবত এই নির্দেশের বিপরীত প্রচারনাও শিক্ষা বা নির্দেশনা রাষ্ট্রীয় ও রাজার চামচা আলেমদের কাছ থেকে ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয় কারণ আহলে বাইতের ঘোষিত শত্রুরাই দ্বীন ইসলামের ধারক, বাইক ও প্রচারক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলো এই ধর্ম-রাজনৈতিক (Reliso-Political) পরিস্থিতি এক জটিল আকার ধারণ করলো। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আহলে বাইতদের শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করে। উপরন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের ধর্মীয় দ প্রচারের জন্য তাদের নিজস্ব আলেম শ্রেণি তৈরি করলো তাদের মূল দায়িত্ব ছিল আহলে বাইতের প্রদত্ত শিক্ষার বিপরীত বক্তব্য উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কোরআনের অপব্যাখ্যা ও হাদিস রচনার ব্যবস্থা করে তা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচারের নীতি গ্রহণ করে।
রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধর্মপরায়ন হওয়ায় এই ধর্মীয় আক্বীদার বিশ্বাস ধারণের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অস্বীকৃতি। পৃথিবীর সকল ধর্মেই এই ধারণা বা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি একজন ধর্মপরায়ন, ধম্মানুবাদী নীতিবোধ সম্পন্ন মহান ধর্মীয় ব্যক্তি হবেন। এই মৌলিক ঈমানী ধারণা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং এই concept ই অস্বীকার করা হয় অর্থাৎ মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নিয়োগ/নির্বাচন/অনুমোদন সন্তুষ্টি ইত্যাদি কনসেপ্ট অস্বীকার করা হয় এবং এর বিপরীতে যে কোন পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করলেই তার উপর আল্লাহ্‌ সন্তুষ্টি এই ধারণা সমাজে ব্যাপকভাবে চালু করা হয়। অন্য কথায় অবৈধ বল প্রয়োগ ও হারাম পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখলকারীকেই আল্লাহ্‌ বেশি পছন্দ করেন এমন বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ধর্ম ও রাজনৈতিক দর্শনে বিভ্রান্তি

এ বিষয়টি সর্বজনবিদিত যে, হযরত আলী (আ.), রাসূল (সা.) এর বৈধ উত্তরাধিকারী আবার জনগণের প্রকাশ্য ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্র প্রধান অথচ তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি শক্তিশালী মুসলিম গ্রুপ যুদ্ধ ঘোষনা করে (১) বায়াত ভঙ্গকারী (২) ধর্ম বিদ্রোহী (৩) ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী। তখন জনমনে প্রশ্ন দেখা দেয়। সব যুদ্ধেকে ন্যায়ের পথে আছেন এবং কেন বা কোন যুক্তিতে। কেই বা অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত আর অন্যায় পথে যাওয়ার কারণ কি? এ সকল প্রশ্ন বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে আত্ম প্রকাশ করে। বিরাজমান দলের কার্যকলাপের ব্যাপারে কেউ যদি নিরপেক্ষতা ও নীরবতা অবলম্বন করে তাহলে কোন যুক্তিতে ও

শরিয়তী দলিলের ভিত্তিতে যে এ নীতি অবলম্বন করছে। এ সকল প্রশ্ন কয়েকটি নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট মতবাদের সৃষ্টি করে। এসব মতবাদের অনুসারীরা তাদের মতবাদ যে সুদৃঢ় ধর্মীয় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠাতা প্রমাণের জন্য কোরআন ও হাদিসে আশ্রয় নেয়। ফলশ্রুতিতে পর্যায়ক্রমে এসব গ্রুপ ধর্মীয় দলে রূপান্তরিত হতে থাকে। এই পরিস্থিতি অধিকতর জটিল আকার ধারণ করে যখন এটি প্রমাণিত হয় যে, অন্যায় যুদ্ধ, প্রতারণা, ধোঁকা, মিথ্যাচারের মাধ্যমে উমাইয়া নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয় তখন এই জঘন্য অবৈধ কর্মখাণ্ড এক ধরণের বৈধতা পেয়ে যায়। ফলে বিরোধমূলক বিতর্ক ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি বিজয় থেকে নতুন নতুন রাজনৈতিক ধর্মীয়-দার্শনিক বিতর্কের সৃষ্টি করে। প্রতিটি নতুন সমস্যাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট ফেরকার সৃষ্টি বা জন্ম হতে থাকে।

কোরআন ব্যাখ্যায় মত পার্থক্য

কোরআন ও হাদিস ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে কয়েকটি চিন্তাগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। পবিত্র কোরআন মানব জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার সমাধান সম্বলিত ঐশীগ্রন্থ। পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি করা সহজ নয়। আল্লাহ্ স্বয়ং এটি ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিয়ে রাসূল (সা.) এর মাধ্যমে তা বর্ণনা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাসূল (সা.) এর ওফাতের পর পবিত্র কোরআনের বাণী এবং তাঁর নিজের কথা হাদীস নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ ঘটে। কারণ এ ব্যাপারে বিভিন্ন শাসক এ সম্পর্কে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন ধরণের সেন্সরশিপ বা নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এরই ফলশ্রুতিতে কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা জনিত ভিন্নতা তথা পরস্পর বিরোধীতা একটি স্থায়ী ধর্মীয় সমস্যার সৃষ্টি করে যা অদ্যাবধি বিদ্যমান।

এ জ্ঞানের সূত্র বা উৎস হিসাবে ঐশী কোরআনের মতবাদের অস্বীকৃতি

রাসূল (সা.) ছিলেন আল্লাহ্র নবী ও রাসূল। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার উৎস হলেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। আর ওহী লব্ধ জ্ঞানই চূড়ান্ত সত্য জ্ঞান। এই জ্ঞানের ধারাবাহিকতা চির ভাস্বর রাখার জন্য আল্লাহ্র রাসূল আহলেবাইতের মহান সদস্যদের ইমাম হিসাবে ঘোষণা দিলেন। যাতে তারা প্রকৃত পক্ষে রাসূল (সা.) এর জ্ঞানের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে জনগণের নিকট ধর্মীয় জ্ঞান প্রচার করতে পারেন। যেহেতু রাসূল (সা.) এর পর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত ও নির্বাচিত ব্যক্তির পদবী ইমাম বা ইমামত কনসেপ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকার করা হয়। ফলে মানজাতির সাথে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঐশী সম্পর্ক বা উৎস যেমন এলাজ্জল গায়েব, ইলমে লাদুন্নী বা এ ধরণের বিশেষ জ্ঞান আহরণের বিষয়টিও প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফলে বিভিন্ন চিন্তা গোষ্ঠীর (School of thouary) এর উদ্ভব হয় এবং সবাই নিজের নিজের চিন্তাধারা সঠিক বলে মনে করে আত্ম তৃপ্তি লাভ করে। এর ফলে সমাজে একটি স্থায়ী মত বিরোধের রাস্তা পরিস্কার হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্লাটো এ বিস্টোমলের দর্শনের আলোকে কিছু অমুসলিম পণ্ডিত কোরআন বুঝবার চেষ্ট করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মকে সাধারণ জ্ঞান বা Common Sense এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কোরআনের আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের ব্যাখ্যাজনিত জটিলতা

আইন প্রণেতার একটি চিরন্তন পদ্ধতি হলো তার পক্ষ থেকে যেন তাঁর আইন ব্যাখ্যা কারক কর্তৃপক্ষ থাকে। রাষ্ট্রীয়ভাবে এ কাজটি করার জন্য বিভিন্ন দেশের সুপ্রীমি কোর্ট এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। আল্লাহ্র পক্ষ

থেকে এ কাজ করে থাকেন নবী-রাসূল উলিল আমর-ইসাম-খলিফা-হাদী-ওলী-মুর্শিদ-সালেহীন-যিকিরকারী, আল্লাহ্‌র বিবেচনায় আলেম ইত্যাদি। যেহেতু রাসূল (সা.) এর পবিত্র ধরণের বিশেষ জ্ঞানের গুণে গুণান্বিত ব্যক্তির কনসেপ্ট অস্বীকার করা হয় তাই বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করে। কারণ কোরআনে এমন কিছু আয়াত আছে যা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে। আবার এমন কিছু আয়াত আছে যাতে মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী আয়াতের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চিন্তা গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে।

এছাড়াও আল্লাহ্‌র পবিত্র গ্রন্থ যেহেতু আল্লাহ্‌ কর্তৃক সংরক্ষিত তাই শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শত্রু আহলে বাইতদের মর্যাদাহানির জঘন্য উদ্দেশ্যে তারা দরবারী আলেমদের মাধ্যমে কোরআনের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করে। রাসূল (সা.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে যে সব সম্ভাব্য/বক্তব্য রয়েছে তা পর্যালোনা করে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। তিনি নূরের নবী। তিনিও কোরআন অবিচ্ছিন্ন। তিনি সবাক কোরআন। নবীদের সাধারণ মানুষ মনে করা কুফরী। কারণ নবী-অর্থ যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গায়েবের জ্ঞান যা নতুনভাবে জনতার কাছে প্রকাশ করেন। এরই সামর্থক পদবী হলো পয়গম্বর। রাসূল শব্দের অর্থ হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে যিনি আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পান করে থাকেন। অনুরূপভাবে এই ধরণের মহান ব্যক্তিকে ইংরাজীতে PROPHET অর্থাৎ যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে গায়বের কথা তথা ভবিষ্যদ্বানী করে থাকেন। হিন্দু ধর্মে ও নবী রাসূলদের পক্ষ থেকে ধরায় আগমন/অবতরণ করে আল্লাহ্‌ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করেন। অর্থাৎ সকল ধর্ম মতেই নবী-রাসূল কোন সাধারণ ব্যক্তি নন বরং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহ্‌র বিশেষ মনোনীত ও নির্বাচিত ব্যক্তি। অথচ কোরআনের বিচ্ছিন্ন আয়াত অপব্যাখ্যা করে দরবারী আলেমদের একশ্রেণি প্রচার করলেন, তিনি সাধারণ মানুষের মত তাঁর ভুলত্রুটি হয়। তিনি গায়েব জানেন না তিনি মানবীয় বহুবিদ দুর্বলতার অধিকারী ইত্যাদি নাউজিবিল্লাহ্‌)।

এরই ধারাবাহিকতায় অসত্য/জাল হাদিসের মাধ্যমে রাসূল (সা.) কে কোরআনের নির্দেশ অমান্যকারী, ভোগী, শ্রেণি ইত্যাদি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ্‌)। এই সূত্র অনুসরণ করে বানোয়াট হাদিসের মাধ্যমে আহলে বাইত এ রাসূলদের সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তিকর ঘটনা বর্ণনা করে তাদের মর্যাদাহানি করা।

আবার কোরআনের নির্দেশের বিরপীতে নির্দেশনা হাদিসের মাধ্যমে সৃষ্টি করে ইসলামী যে একটি বাস্তবতা ধর্ম বা ই ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা আল্লাহ্‌র নির্দেশ বাস্তবে প্রতিপলন করা অসম্ভব এই ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা। বনু উমাইয়া-বনু আব্বাসীয়গণ ইসলামের নাম ভাঙ্গিয়ে রাজ সিংহাসন অধিকার করে আল-রাসূলের খোদা প্রদত্ত মান মর্যাদাহতে বঞ্চিত করেই ক্ষান্ত হয় নাই বরং তাদের ইবাদতগাহ, হুমবাখানা হতে উচ্ছেদ, ইহরান্তে নির্বাসন ষড়যন্ত্র, মিথ্যা অপবাদে রাজদ্রোহী, দণ্ড বিষ প্রয়োগে হত্যাসহ এমন কোন জঘণ্য কুকর্ম করতে দ্বিধা করে নাই। দুনিয়া পূজারী এই রাজা-বাদশাহ্‌গণ ও তাদের সহযোগী রাজকর্মচারীবৃন্দ প্রাসাদ দরবার দলাহজ তারগুলো নট নটিনী কবিয়াল, থা কথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মদ্য পান বাদ্য-বাজনা কিসসা-কাহিনী, আরব্য রজনীর মঞ্চ, জুয়াবাজী, ঘোড় দৌড় ইত্যাদি অপসংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে ধর্ম নিরপেক্ষতা নাস্তিকতা, ধর্ম ও রাজনীতির বিভাজনের চিন্তা ধারার বন্যায় সমাজ জীবন কে প্লাবিত ও কলুষিত করে। ধর্মের লেবাসধারী খলিফারা নিজেরা নায়েবে রাসূল পদবী ধারণা করে যখন বিকৃত মস্তিষক বিলাস ব্যসনে মত্ত ধর্মের রুহকে সমাধিস্থ করে-সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের নামে বিরাট ইসলামী স্থাপত্যের অট্টলালিকা, মসজিদ মিনার নির্মাণের মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছিল।

পরবর্তী আদেশ নির্দেশগুলি যখন দলিত, মথিত, কোরআনী ব্যাখ্যা রাজার স্বার্থ মোতাবেক যখন জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হলো দ্বীনের চতুর্দিকের দেওয়াল, ছাদ ভিত সাপানাবলী ভাঙ্গিয়ে খান খান হয়ে গেল, ধর্মের চেরাগ নিভু নিভু। আর ধর্মের খোলসই দৃশ্যমান ছিল নামায, রোযা, হজ, যাকাত আনুষ্ঠানিকতায পরিণত হয়। দুনিয়া লোভী তথা কথিত আলেম, মাশায়েখ সম্প্রদায় অধিকতর দুনিয়াদার শাসক প্রদত্ত, আলখাল্লা সনদ, যেভাবে ভূষি হয়ে তাদের সাহচর্য্যে প্রত্যেক কথায় বা কাজে ধমৃয়ি অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে নামাযের কর্মকাণ্ড সমর্থন করত, এ সমস্ত দুনিয়াদার ক্ষমতালোভী আলেমদের কাজ পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে হযরত গাউসুল আযম শেখ আবদুল কাদের জিলানী বলেন হে ইলম ও আমলে বিশ্বাসঘাতকগণ, শাসকবৃন্দের সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? হে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দুশমন, হে আল্লাহ্র বান্দাগণের ডাকাতদল তোমরা কি পরমাণ জুলুম ও মুনাফেকীত লিপ্ত রয়েছে। তোমাদের এই মুনাফেকী আর কতদিন চলবে? হে আলেমগণ আউলিয়া দরবেশগণ, বাদশাহ্ ও সুরতানদের জন্য আর কতদিন তাদের নিকট হতে ধন দৌলত ও দুনিয়ার কামনা বাসনা ও ভোগ ও গ্রহণ করতে থাকবে? তোমরা এবং অধিকাংশ রাজা-বাদশাহ্ এই যুগে আল্লাহ্তালার ধন দৌলত এবং তার বান্দাগণের সম্বন্ধে যালেম ও বিশ্বাসঘাতক হয়ে রয়েছে? এই ধরণের একজন আলমকে লক্ষ্য করে তিনি ফরমাইয়াছেন, " তোমার লজ্জা হয় না যে তোমার লোভ, তোমাকে জালেমদের খেদমত ও তোষামেদী এবং হারাম খাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করয়েছে। তুমি আর কতদিন হারাম খেতে থাকবে এবং দুনিয়ার এই জালেম বাদশাহ্গণের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। তুমি যাদের খেদমত ও তোষামোদীতে রয়েছে তাদের বাহশাহী অচিরেই শেষ হয়ে যাবে। হযরত বড়পীর সাহেব (রা.) আরো বলেন, হুজুর (সা.) এর দ্বীনের প্রাচীর একটির পর একটি ধ্বসে পড়তেছে। এটার ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যাচ্ছে। ওহে দুনিয়াবাসী আমি এবং ভাঙ্গা প্রাচীর মেরামত কর। দ্বীনের প্রতি অবিচল হও। যা ধ্বসে গিয়েছে এটা মজবুত করে দাও। একাজ একার নয় সকলে মিয়ে এটা সমাধা করতে হবে। ওহে চন্দ্র, সূর্য এবং দিন তোমরা সকলে আস।

ত্বরিকত কি ও কেন?

ইতিহাস পর্যারোচনা করে আমরা সন্দেহাতীতভাবে জানতে ও বুঝতে পারলাম যে, নবী (সা.) এর ফোতের ত্রিশ বৎসর পরে রাসূল বংশের কুখ্যাত দুশমন উমাইয়া কুচক্রীগণ সম্পূর্ণ অবৈধভাবে ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্বের অধিকারী হয়। এই ধর্ম বিরোধী ধর্ম-রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অবৈধভাবে চিরস্থায়ী করার লক্ষ্যে ধর্মকে ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়ায় তারা এক শ্রেণির আরেম তৈরি করে যারা তাদের প্রভুদের ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামের নামে এক নতুন ধর্মমত যথা আক্বীদা ও আমলে ব্যাপক পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটনায়। এই ধর্মমতকে আমাদের জাতীয় সুফি কবি কাজী নজরুল ইসলাম এজিদী ধর্ম বা এজীদী ইসলাম হিসাবে অভহিত করেছেন। এদিকে আল্লাহ্র ওয়াদা "আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান হতে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসবে তখন যারা আমার সৎপথের নির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (সূরা বাকারা : ৩৮)।

অর্থাৎ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়েতের ধারায় আগমন বা বিরাজমান থাকা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ কারণেই মানবজাতি কখনই এই মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকতে পারে না। এই হেদায়েত বা উৎস হলো দুটি একটি হলো পবিত্র কোরআন। অর্থাৎ কোরআনের মাধ্যমে ধর্ম শিক্ষা আর তা হলো আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল (সা.)

প্রেরণ করেছেন যে, তার আয়াতসমূহ (পবিত্র কোরআন) তাদের নিকট তিলাওয়াত করে তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও তারা পূর্বে স্পস্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল" (সূরা আল ইমরান : ১৬৪)। কোরআনের শিক্ষার ব্যাপকতা, বিবৃতি ও জটিলতা জোভার পর আমরা জানতে পারলাম যে, এটি কোন সাধারণ আরবী ভাষাবিদ পাণ্ডিত্যের বিষয় নয় শুধুমাত্র আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়োজিত ও নির্বাচিত ব্যক্তিই এ কাজ করার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব। এই দুরুহ ফরজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যই রাসূল (সা.) তারপর কে এই দায়িত্ব নিবে সে কথা স্পষ্টভাবে তার উম্মতকে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর ওফাতের পর তার নির্দেশ প্রকাশ্যভাবে লংঘন করা হলো। তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাসূল (সা.) এর আহলে বাইত আল্লাহ্র নির্দেশে শিক্ষা সমাজে চালু করলেন তাই ত্বরিকতের শিক্ষা।

ত্বরিকত শব্দের আভিধানিক অর্থ-জনপথ বা রাস্তা এবঙ ত্বরিকত শব্দের পারিভাষিক অর্থ-পথ চলার নিয়ম কানুন, বিধি-বিধান, আইন-কানুন, নিয়মাবলী, পদ্ধতি, প্রণালি, নির্দেশনা, নির্দেশিকা, দিশা, দিশারী প্রভৃতি। পথ চলার নির্দেশনা অনুযায়ী যে পথ ও মত অবলম্বন করে পরম প্রেমময় মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি সাধন করা যায়, তারই জ্যোতির্ময় সভায় উপনীত হওয়া যায়, তারই দর্শন লাভ করা যায়, তাকেই তাসাওউফ শাস্ত্রের পরিভাষায় ত্বরিকত বা ত্বরিকা বলা হয়।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র সাথে প্রেম তথা সাক্ষাৎকারের বিষয়টি যে মানব জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং সকল প্রকার ইবাদতের ভিত্তি মূল এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের নির্দেশনা:

১. নিশ্চয়ই যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না (এই দুনিয়ায় জীবিত অবস্থায়) এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং এতেই পরিতৃপ্ত থাকে এবং ারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল, এদেরই আবাস অগ্নি এদের কৃত কর্মের জন্য (সূরা ইউনুস : ৭)।

হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করতে থাক। পরে তুমি তাঁর সাক্ষাঃ লাভ করবে (সূরা ইলশিকাক : ৬)।

মহান আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের পথ নির্দেশনার দায়িত্ব নবী-রাসূলদের উপর দেওয়া হয়েছিল। এই দায়িত্বভার রাসূল (সা.) হযরত আলী ও তাঁর বংশের নির্বাচিত ও মনোনীত ব্যক্তিদের অর্পণ করার বিষয়টি প্রকাশ্যে তার অনুসারীদের বলে দিয়েছিলেন এবং তাদের পদবী আল্লাহ্র নির্দেশে ইমাম নির্ধারণ করেন। এই মহান ইমামগণ ধারাবাহিকভাবে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্বে বিরাজমান ছিলেন। আমরা ইতোমধ্যে জানি যে, এই মহান ইমামগণ হযরত ইমাম হোসাইন (আ.) বংশধর ছিলেন। এরপর দৃশ্যত ইমাম পদবীর কার্যক্রম প্রকাশ করা হয় না। পরবর্তীতে হযরত হাসান (আ.) এর বংশধারা গাউসুল আযম শেখ মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী দৃশ্যপটে জাহির হন। রাসূল (সা.) এর ঘোষণা অনুযায়ী মহান আহলে বাইত এর পবিত্র বংশধর। তাদের খলিফা, ভক্ত ও অনুসারীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে রেসালত- বেলায়েত-ইমামতের দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন। আর এরাই হলেন উলিল আমর, ওলীয়াম মুর্শেদা, হাদী, মোমেন, মহসীন, সালেহীন, মুকাররেমীন প্রভৃতি পদবী ধারণ করে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হেদায়েতের মহান দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আর আমরা বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের অধিবাসীরা এই মহান ব্যক্তিদের পীর-মুর্শিদ হিসাবে মানি ও জানি। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার উম্মতের নিষ্ঠাবান যোগ্য আলেমগণ হলেন নবীদের উত্তরসুরী।

সুফিবাদ-তাসাওউফ ও সুফিদের পীর-বুজুর্গ বৈশিষ্ট্য

সুফি শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে (১) সাউফ অর্থ পশম (২) সাফা অর্থ পবিত্র (৩) সফ অর্থ সারি, লাইন বা শেণি (৪) **সুফিয়া** (Sophia) ঈশ্বরতাত্ত্বিক জ্ঞান। আবু বায়হান আল বিরুনী যিনি সুলতান ও মাহমুদের (মৃত) ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে রাজ দরবারে বিশ্ব বিখ্যাত ঐতিহাসিক দার্শনিক পণ্ডিত হিসাবে মান্যবর ছিলেন তিনি তার কিতাব "কিতাব উল হিন্দ" এ লিখেছেন যে মূলত সুফি শব্দটি গ্রীক শব্দ Sophia বা সুইউফ থেকে উদ্ভুব হয়েছে। আরব পণ্ডিত বা শব্দটির সঠিক অর্থ না বুঝে উচ্চারণগতভাবে এ শব্দটির কাছাকাছি আরবী শব্দ সাউফ, সাফা, হুফ শব্দ ব্যবহার করেছেন। পরবর্তীতে ইংরেজ পণ্ডিতগণ একই ভুলের শিখার হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে সুফিয়া বা সুইফ এটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ প্রভুর বা ঈশ্বরের জ্ঞান। সুফিগণ সব সময় স্রষ্টার সাধনায় মগ্ন থাকতেন তাকে জানতে চাইতেন তার মহিমা বুঝতে চাইতেন। তাঁর আদি রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেন প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসের শিষ্য প্ল্যাটো তাঁর Republic পস্তকে Philosophi Kenga এ যে দার্শনিক রাজার বিষয় উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃত পক্ষে একজন ঐশ্বরিক জ্ঞানে, গুণে ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির কথাই বুঝিয়েছেন। পরবর্তীতে গ্রীস সমাজ ধর্ম নিরপেক্ষবাদ ও নাস্তিকতাবাদের ও পৌত্তলিকবাদ প্রসারের সাথে এই শব্দটির অর্থ ঐশ্বরিক জ্ঞান বা ঈশ্বর তাত্ত্বিক জ্ঞানের পরিবর্তে শুধুমাত্র জ্ঞানী শব্দ ব্যবহার করা শুরু হলো। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, এই Sophia শব্দের পূর্বে Philos বা প্রেম শব্দ যোগ করে Pholosopher শব্দটি তৈরি করা হলো এবং অর্থ হিসাবে ঘোষণা করা হলো জ্ঞান প্রেমী বা দার্শনিক। বাংলাভাষাবিদ পণ্ডিতগণ দর্শন বা দার্শনিকের সাথে Philosophi বা জ্ঞান প্রেমীদের যোগসূত্র এভাবে নিরুপন করলেন যে, যিনি জ্ঞান /অন্তচক্ষে বা অলৌকিক/দিব্য দৃষ্টিতে সত্র/প্রত্যক্ষ করেন তিনিই দার্শনিক বা সত্য নিষ্ঠা বা জ্ঞানী-জ্ঞান প্রেমী।

এরই ধারাবাহিকতায় উনবিংশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী হিসাবে Doctor of Philosophi নির্ধারণ করা হয় পর্যায়ক্রমে তা বিশ্বব্যাপি প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দুঃখজনক বিষয় হলো গ্রীক ভাষায়ই এর অর্থ ছিল ঈশ্বর প্রেমী বা ঈশ্বরতত্ত্বও জ্ঞান জ্ঞানী এই বিষটি এই ডিগ্রী যারা প্রদান করে থাকেন তারাই জানেন বা মানেন না।

ইসলামী পরিভাষায় সুফি সাধনায় রত হওয়া ত্বরিকত সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, আত্মকর্ষ সাধনের রত হওয়া, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে নিয়োজিত হওয়া আল্লাহ্‌তে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিকল্পে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া, আল্লাহ্‌তে সমাজিত হওয়া, আল্লাহ্‌র রক্তে রঞ্জিত হওয়া আর এর প্রকৃত অর্থ হলো আল্লাহ্‌তায়ালার স্বভাবে বা তার পুত্র পবিত্র ও চরিত্রে কোন প্রকার কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা, প্রতারনা, পরশ্রীকাতরতা যৌন্যেত্তেজনা, পানাহার, প্রত্যাশা নিদ্রা প্রভৃতি পশিব প্রবৃত্তির লেশ মাত্র নাই এমন ঐশী স্বভাবে স্বভাবিত হতে পারলেই জৈবিক উপাদানে আবদ্ধ মানবাত্মা ঐশী সত্তায় পৌছাতে পারে। এই অর্থেই আল্লাহ্‌তালা কোরআনে ঘোষনা করেছেন, তোমরা আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্চিত হও, তথা আল্লাহ্‌র ঐশী স্ববাবে স্বভাবান্তি হওয়। আর আল্লাহ্‌ ছাড়া এমন কে আছে যে, সর্বোত্তম রঙ্গ প্রদান করতে সক্ষম।

সুতরাং, যিনি আল্লাহ্‌র স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, আল্লাহ্‌র ঐশীগুণে গুণান্বিত, আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঞ্জি হতে পেরেছেন তিনিই আল্লাহ্‌তালার বেলয়েত প্রাপ্ত ওলী, সুফি দরবেশ, আরেক কামেল, বুজুর্গ, মুর্শিদ, শেখ, ইমাম, পীর, কুতুব, বা ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানব নামে অভিহিত। এমন মহা মানবের সম্পর্কেই খোদাতালা কোরআনের ভাষায় সুষমাচার দান করেছেন যে, জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আছে সুসংসবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে, আল্লাহ্‌র বাণীর কোন পরিবর্তন নাই, এটাই মহা সাফল্য। (সূরা ইউনুস, ৬২-৬৪)। এমন খোদা

প্রেমিক, খোদাভীরু, খোদাভক্ত ওলীদের অনুসৃত পথকেই বলা হয় ত্বরিকা আর এই তত্ত্ববিদকে বলা হয় তাসাউফ বা সুফিবাদ।

সুফিবাদ সুফি সাধনা মূলত একটি ধর্মীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে বলেন : তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত-ধর্মীয় বিজ্ঞানআত্মতত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভুত কল্যাণ দান করা হয়। (সূরা বাকারা : ২৬৯) যাকে এই ধর্মীয় বিজ্ঞান তথা হেকমত যেন করা হয়েছে তিনিই প্রকৃত সুফি। কেননা হেকমতের অপর নাম তাসাউফ তত্ত্ব বা সুফিতত্ত্ব সুফিবাদ।

সুফি তত্ত্ব বা তাসাউফ বিদ্যা তথা শাস্ত্রের মর্ম কথা

দৈহিক নয় আত্মিক পরিশুদ্ধতা বা চারিত্রিক পবিত্রতাই মানব মুক্তির একমাত্র পথ। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে এরশাদ করা হয়েছে :

(১) সেই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষিত (অপবিত্র) করবে। (সূরা শামস : ১০)।

(২) হে প্রশান্ত বিত্ত, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আইস সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে আমার বান্দাদের অন্তভুক্ত হওয় আর আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। (সূরা ফজর : ২৭-৩০)।

অর্থাৎ মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র নিকট বাধ্যতামূলক প্রত্যাবর্তনের যে অপরিহার্য শর্ত রয়েছে তাতে ব্যক্তির চিত্তের পবিত্রতা, তুষ্টি, সন্তুষ্টি আল্লাহ্র একজন আদর্শ বান্দা হতে হবে এবং তখনই কেবল সে বেহেশতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করবে। সুফিতত্ত্ব বা তাসাউফ শাস্ত্রের মর্মকথা হলো-মানব চরিত্র সম্পর্কে সত্য ও সঠিক ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করা। অর্থাৎ মানব চরিত্রে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সৎ গুণাবলী অর্জন করা এবং পাশবিক প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা বর্জন করা। এই আত্ম সংগ্রামে লিপ্ত থাকা এবং আত্মশুদ্ধি লাভের প্রচেষ্টয় রত থাকার নামই তাযকিয়ায়ে নফস বা এসলাহে নফল তথা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। মানব চরিত্রের বাহ্যিক গুণাবলী অর্জন করার প্রকৃত অর্থ হলো শরীয়তের নির্দেশনাবলী অনুযায়ী শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা যে সব আদেশ-নিষেধ পালন করা হয়, যেমন নামায-রোযা, হজ, প্রভৃতি ও আত্মিক ও মানসিকভাবে যেসব নির্দেশনাবলী শরিয়ত অনুযায়ী পালন করা অত্যাবশ্যক, তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার নামই বাহ্যিক গুণাবলী অর্জণ করা বুঝায়। অর্থাৎ শরিয়তসম্মত বাহ্যিক সদাচার ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি প্রতি পালন করাকেই বাহ্যিক গুণাবলী লঅভ করা বুঝায়। আর অভ্যন্তরীণ গুণালী অর্জন করার প্রকৃত অর্থ হলো এখলাস বা মনের বিশুদ্ধতা লাভ শুরুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সবর ধৈর্য ধারণ, যুহদ জাগতিক ধন সম্পদ। মান-সম্মান লাভ ও ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগ্য বা বিরুপ মনোভাব পোষণ সিদিক সত্যবাদিতা রক্থা করা মহব্বত আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতা অর্জন তাওয়াব-বিনম্র মনোভাব পোষণ, অর্থাৎ ব্যবহারক জীবনে দীনতা-হীনতা প্রকাশ করা জাগতিক ভূ-সম্পদ, মানসম্মত লাভের প্রতি হৃদয়ে ঘৃণার ভাব উদ্রেক করা এবং জাগতিক ঐশ্বর্য লাভের মোহকে তুচ্ছ জ্ঞান মনে করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রেমে উদ্বেলিত হওয়াকেই আভ্যন্তরীণ গুণাবলী অর্জন করা বুঝায় এবং এসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট থাকাই একজন নিম্নস্তরের সুফির চরিত্র।

সুফি শিক্ষার উপকাতিা

সুফি দর্শনের উপকারিতা সম্পর্কে বলা যায় যে, এই শিক্ষা মানবাত্মার বিশোধন শিক্ষা দেয়, নৈতিক জীবনকে উন্নত পর্যায় পৌঁছায়, স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনে সক্ষম করে তোলে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনও

দৈহিক জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। সুফিবাদের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং এর অভীষ্ট লক্ষ হচ্ছে আত্মার চিরন্তন সুখ শান্তি লাভ করা।

এছাড়াও সুফি সাধনার মাধ্যমে জীবন, জগত ও জগত স্রষ্টাকে প্রত্যক্ষভাবে জানার উপায়-বিশেষ এবং পরম সত্য ও সত্তায় উপনীত হবার একটি আত্ম তাত্ত্বিক উপকরণ লঅভের উপায়ই হলো সুফি সাধনার ফল। আত্ম সাধনাও আত্ম সংগ্রামের মাধ্যমে প্রেমময় আল্লাহ্‌র পরম প্রেমোপলব্ধির ফর লঅভ করাই সুফি সাধনার অভীষ্ট লক্ষ বস্তু। সুফিবাদ মানুষকে আত্ম সংযম শিক্ষা দেয় এবং ব্যক্তি স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরিস্বার্থে নিজেকে আত্মোৎসর্গ করে সেবার অন্য প্রেরণা যোগায়। এ কারণে সুফিবাদ সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করে দেয়। সুফি দর্শনের সৌজন্যে মানুষ তার দেশ কালের চতুমাত্রায় আবদ্ধ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান মার্গে পৌছায়। তাই সে ব্যক্তি পরিবার, গোষ্ঠীর ধর্ম বর্ণের এক দেশদর্শী চিন্তার বহু উর্ধ্বে উঠে মাটির মানুষ তখন নূরের পেরেশতাকেও ছেড়ে যায়। এই রূপ মানব দ্বারাই সামাজিক জীবন হয় সুখ, শান্তির ও সমৃদ্ধির এবং মানুষের আন্তর্জাতিক জীবনও হয় নিরুপ দ্রব ও অনাবিল।

সুফিতত্ত্ব শিক্ষা ও সাধনা জানা প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের শিক্ষার মূল স্পিরিট হলো সুফিবাদ। এই চিন্তাধারা সমাজ থেকে উৎখাত করে এক শ্রেণির আলেম ইসলাম ধর্মের নামে যে ধর্মমত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চান তার মাধ্যমে কোন কোন ক্রমেই পরলোকে মুক্তি অর্জন করা যাবে না। কারণ এই আলেমরা দাবি করেন জন্মগতভাবে একজন ইসলাম ধর্মবালম্বী দৃশ্যত নামায, রোযা, হজ, যাকাত আদায় করলেই বেহেশতে যাবে। অথবা প্রত্যেক মুসলমান জন্মগতভাবে তার পাপের জন্য কিছু দিন দোজখে অবস্থান করলেও তারা অবশ্যই এক সময় বেহেশতে যাবে। এ মিথ্যা বা জাল হাদিসের মাধ্যমে এসব কথা যে প্রকৃত পক্ষে কোরআন বিরোধী কথা, বা চিন্তাধারা তা প্রমাণ করার জন্য পবিত্র কোরআন থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে।

আরববাসীরা বলে, আমরা ঈমান আনলাম। বল তোমরা ঈমান আন নাই, বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পন করেছি। কারণ ঈমান এখনও তোমাদের আত্ম সমর্পণ করেছে, কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। (সূরা হুজ্জরাত : ১৪)

বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মৌখিকভাবে কলেমা পাঠ করাকে আল্লাহ্‌তালা ঈমানদার হিসাবে স্বীকৃতি দেন নাই। বরং অন্তরে ঈমান আনা একটি অতি আয়াসসাধ্য ও সাধনালব্ধ বিষয় সেটি না হলে আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ ঈমানদার হওয়া যাবে না।

নামায একটি অতি কঠিন বিষয় অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের ঈমানদার না হলে তাঁর নামায আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য হয় না। এ ব্যঅপারে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ইহা বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে কঠিন" (সূরা বাকারা : ৪৫)।

এক ধরণের মুনাফিকরাও দৃশ্যত নামায আদায় করে থাকে। এ ধরণের লোক সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা : নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহ্‌র সাথে ধোঁকাবাজ করে। বস্তুত তিনি তাদেরকে এটার শাস্তি দেন আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ্‌কে তারা অল্পই স্মরণ করে (সূলা সেনা : ১৪২)।

কার্যত ধর্ম অস্বীকারকারীরাও দৃশ্যত নামায পড়ে এবং তারা ওয়াহল নামক দোজখে যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ বলেন, তুমি কি দেখেছ তাকে যে, দ্বীনকে অস্বীকার করে/প্রত্যাখ্যান করে/ অমান্য করে। সে তো সেই, যে ইয়াতীমকে রুভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান উৎসাহ দেয় না। সুতরাং, দুর্ভোগ সেই

সালাত আদায়কাররি দর (যারা ওয়াইল দোযখে যাবে)। যারা তাদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য এটা করেএবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাট সাহায্য দানে বিরত থাকে। (সূরা মঈন : ১-৭)।

আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে একজন মুত্তাকরি পরিচয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন

পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে (দৃশ্যমান নামযে) কোন পুণ্য নাই, কিন্তু পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ্‌ পরকাল, ফেরেশ্‌তাগণ সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে নঈমান আনয়ন করলে এবং আল্লাহ্‌ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থনাগণকে এব ংদাস মুক্তির জন্য কোর পার্থকভাবে বিপদগ্রস্তকে) অর্থ দান করলে, সালাতে কায়েম করলে ও যাকাত দান করলে এব প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, অর্থ সংকটে দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রামে সংকটে ধৈর্যধারণ করলে এরাই তার যাহেরা সত্যপরায়ন এবং এটাই মুত্তাকী : (সূরা বাকারা : ১৭৭)।

কোন ব্যক্তি আমানু, মোমিন, মোত্তাকী, আলবাব, সালেহীন বা অনুরূপ তা তার পার্থিব কর্মকাণ্ডের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (সা.) বলেছেন দুনিয়ার পার্থিব জীবন আখে রাতের জীবনের শস্য ক্ষেত্র স্বরূপ। মানব জীবন যে একটি পরক্ষিা কেন্দ্র এবং তার সকল কর্মকাণ্ডই যে এক একটি পরীক্ষার বিষয় বস্তু সে সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা। এরশাদ হচ্ছে:

(১) আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য। এ জন্য আমি তাকে শোনার ও দেখার শক্তি দিয়েছি-আমি তাকে পথের নিদৃেশ দিয়েছি হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে (সূরা দাহর বাইনসান : ২-৩)।

(২) আলিফ লাম, মীম। মানুষ কি মনে করে যে, আমরা বিশ্বাস করি, এই কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদিগকেও পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ্‌ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী। তবে কি যারা মন্দকর্ম করে তারা মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ (সূরা আফাবুত : ১-৪)।

(৩) হে মানুষ আমি তোমাদের মধ্যে এককে দিয়ে অপরকে পরীক্ষা করি্ তোমরা কি ধৈর্য ধরবে? তোমার প্রতিপালক সর্বই দেখেন। (সূরা ফুরকান : ২০)।

(৪) নিশ্চয় আমি তোমাদের কাউকে ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে, আর কাউকে ধনে প্রাণে ও ফসলের ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করব, আর যারা ধৈর্য ধরে তুমি তাদের সুখবর দাও (সূরা বাকারা : ১৫৫)।

(৫) আর জেনে রাক যে, তোমাদের ঋণ,সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তো এক পরীক্ষা, আর আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে তো বড় পুরস্কার (সূরা আনফাল : ২৮)।

(৬) আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না প্রকাশ হয় কে তোমাদের মধ্যে জেহাদ করে আর কে ধৈর্য্য ধরে আর আমি তোমাদের খবর (কার্য কলাপ) পরীক্ষা করে দেখব (সূরা মুহাম্মদ : ৩১)।

(৭) মহিমান্বিত তিনি, সার্বভৌম ক্ষমতা যাঁর হাতে; কিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান, তিনি মৃত্যু ও জীবনের সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষার জন্য। কে তোমাদের মধ্যে কর্ম ভাল : (সূরা মূলক : ১-২)

(৮) মানুষকে দুঃখ সৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে ডাকে। তারপর যখন তাকে অনুগ্রহ করি তখন সে বলে। আমি তো এ আমার জ্ঞানের মাধ্যমে পেয়েছি। আসলে এ এক পরীক্ষা। কিন্তু ওদের অনেকেই বোঝে না। (সূরা নুমার : ৪৯-৫১)।

(৯) তিনিই পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি করেছেন। আর তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। তোমাদের কাউকে আনার উপর মর্যাদায় বড় করেছেন (সূরা আনয়াস : ১৫৫)।

(১০) আর এভাবে তাদের একদলকে অন্যদল দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষা করেছি যেন তারা বলে আমাদের মশ্যে কি এদেরকেই আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন। (সূরা আনয়াম : ৫৩-৫৪)।

আমরা উপর্যুক্ত কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত করলাম যে, মানুষের জীবনের সকল কর্মকাণ্ড অবশ্য পরিস্থিতি আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ নজরদারীতে রয়েছে এবং তা তার পরীক্ষার অন্তভক্ত বিষয়। এসব কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে গিয়ে সে যদি আল্লাহ্র নির্বাচিত ও মনোনীত পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদন করি তাহলে সে কেবল আল্লাহ্র পরীক্ষায় সফল কাজ বিবেচিত হয়ে এবং ইহকালের শান্তি, স্বস্তিতে থাকবে এবং পারলৌকিক মুক্তি পাবে এবং পুরস্কৃত হবে অন্যথা সে দুনিয়ার জীবনে কঠিন? কতনা ফ্যাসাদের সম্মুখীন হবে এবং পরকালে শান্তিযোগ্র অপরাধে গ্রেফতার হবে।

পীর কে? এবং কেন?

মানুষ সামাজিকভাবে যে সকল কর্মকাণ্ড করে থাকে তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অনুযায়ী হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে যার নিশ্চিত ও পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক জ্ঞান রয়েছে এমন ব্যক্তিই পীর হওয়ার যোগ্য। আমরা ইতোমধ্যে বিষয়টির গভীরতা, ব্যাপকতা, জটিলতা ও বিস্তৃতি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি তাই এটা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, যে কোন বিষয়ে পারদর্শীতা বা অভিজ্ঞতা অথবা কোন বিষয়ে সফলতা লাভ করতে হলে সে বিষয়ে কোন অভিজ্ঞ বা জ্ঞানি লোকের সাহায্য ও সহযোগিতা নেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সেরূপ আল্লাহ্কে জানা চেনা এবং তাঁর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য একজন অভিজ্ঞ দিশারী বা আত্মনিষ্ঠ সিদ্ধ পুরুষ তথা মুর্শিদে কামেলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এই বাস্তবতার নিরিখে মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির উদ্দেশ্যে পরামর্শ-উপদেশ-নির্দেশ হিসাবে বলেছেন, হে খোদা বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ তোমরা একমাত্র আল্লাহ্কেই ভয় কর এবং সত্য নিষ্ঠ (সাদেকিন) লোকদের সান্নিধ্য গ্রহণ কর। কেননা মহান আল্লাহ্ পাকের ভয়ভীতি ও তার স্বরূপ সম্পর্কে একমাত্র খোদা তত্ত্ব ও লোক ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে তা জানা কখনো সম্ভবনয় এ কারণে আল্লাহ্র ওলী বা পীরদের সাহচর্য ব্যতিরেকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের স্বরূপ জানা বা তাঁর নৈকট্য হাসিল করা সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনের ভাষ্যকার বা বিশেষজ্ঞগণ যথার্থই বলেছেন বর্ণিত আয়াতে সাদেকীন "শব্দ দ্বারা আল্লাহ্র ওলী, পীর মুর্শিদ, হাদী, গাউস, কুতুব, সুফি দরবেশ লোকদেরই বুঝানো হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাসূল (সা.) বলেছন, "আমি কি তোমায় ঐ বিষয়ে অবহিত করবে না। যা ধর্মের পথে খুবই সহায়ক। আর এ দিয়ে তুমি ইহকালে ও পরকালে সফলতা লাভ করতে পারবে। আর তা হলো আল্লাহ্র ওলীদের সমাবেশে গমন। আর যখন তুমি নির্জনে একাকী বাস কর, তখনো তুমি তোমার রসনা আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত রেখো। (মেশকাত)।

হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে এইবলে উদেশ দিয়েছিলেন যে,তুমি জ্ঞানী পুত্র আলেমদের সাহচর্য লাভ করাকে অপরিহার্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করবে। খোদাভীরু লোকদের হিতোপদের খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কেননা বারি বর্ষণ দ্বারা যেমন মৃত ভূমি সজ্জিত হয়ে উঠে তদ্রূপ ঐশী জ্ঞান প্রাপ্ত ওলীদের অন্তর্জ্যোতিতে মৃত প্রাণ সজ্জীবিত হয়ে উঠে। মহাত্মা শেখ আকবর (রা.) বলেছেন কামেল পীরের আনুগত্য

ও বশ্যতা স্বীকার না করে তুমি আজীবন সাধনা করেও প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে নিস্পতি লাভ করতে পারবে না। তাই তুমি যদি কোন ভক্তি ভাজন ওলী-আল্লাহ্‌র সাক্ষাত পাও তবে অবশ্যই তুমি তোমার নিজেকে তার সেবার উৎসর্গ করে দিও। তিনি তোমায় স্বেরূপ পরিবর্তন আনতে চান তা তুমি মাথা পেতে নিও। তোমার নিজের সমুদয় কামনা-বাসনা পরিহার করে কেবল তাঁরই আদেশ নিষেধ পালনে ব্রতী হয়ে যাও। তিনি যা নিষেধ করবেন, তা থেকে তুমি অবশ্যই বিরত থাকবে। তিনি তোমায় যাই করতে বলেন যা কেন, তাই তুমি আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে বরণ করে নিও। মুর্শিদে কামেলের অন্বেষণ করা তোমার জন্য অবশ্য কর্তত্য। যাতে তিনি তোমার আল্লাহ্‌ পাকের সম্পর্কত করে দিতে পারেন। কেননা মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্যই হচ্ছে খোদা পাকের সন্তুষ্টি সাধন ও তারই দর্শণ লাভ। এই অর্থেই আল্লাহ্‌ তাঁর রাসূলকে বলেন, যাা সকাল সন্ধ্যায় তাদের আপন রবের (প্রভুর) আরাধনা-উপাসনা করে থাকে এমন লোকদের সঙ্গেই আপনি অবস্থান করুন।"

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী (র.) বলেছেন এলমে বাতেল বা গোপন বিদারি প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত হতে বাধ্য। শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) বলেন, সহরা সাধক কি তার পাঠেও প্রকৃত আলেম বা নায়েবে রাসূল হওয়া যায় না, যতক্ষণ না তত্ত্ব জ্ঞানের আলোতে হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠে। তিনি আরো বলেন তোমরা আল্লাহ্‌র ওলীর সঙ্গ লাভ কর। তাহলে তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্‌র ওলী হতে পারবে। তোমাদের জন্য এমন একজন পীে কামেলের প্রয়োজন যিনি শরীয়তের বিদ্যা খুবই বিদ্বান (সনদ ছাড়াও তা হওয়া যায়) এর খোদা পাকের আদেশ ও নিষেধ মত পরিচালিত।

মওলানা রুমি (রহ.) বলেন, "আমি যদি আমাকে আমার মুর্শেদে কামেল হযরত শামস তাবরীজের সেবায় আত্মাৎসর্গ করতে না পারতাম, তবে আমি কখনো মওলানা রুমি হতে পারতাম না। সর্বোপরি একজন প্রকৃত পীরে কামেলেরই এই যোগ্যতা থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহে যিনি পবিত্র কোরআনের জাহেরী ও বাতেনী অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানী, মুরিদ বা অনুসারীদের রুহানীভাবে পবিত্র করতে সক্ষম, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান বিশ্ব সৃষ্টি কৌশলে ও পরিচালনা অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যে সব আইন কানুন ও প্রশাসনিক কাঠামোও পদে বিনাসের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তালা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন তা তার মুরিদকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে বলতে ও বুঝতে সক্ষম। তিনিই একজন উপর্যুক্ত পীর বা মুর্শেদ।

পীরের দায়িত্ব

ইমাম গাজ্জালী (র.) মুরীদের প্রতি পীরের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন : পীর তাঁর মুরীদকে সুপথের সন্ধান বাতলে দিবেন। চরিত্র সংশোধনের পথ অবগত করে দিবেন। আল্লাহ্‌ পাকের নৈকট্য লাভের উপায় অবহিতকরে দেবেন। কৃষক যেমন জমি চাষ করে থাকেন, সর্বোত্তম বপন করে থাকেন। আগাছা বা খাই করে থাকেন, সার দিয়ে থাকেন, পানি দিয়ে থাকেন, তদ্রূপ পীরে কামেল ও তার মুরীদের আত্ম কালিমা বিদুরিত করে দিয়ে আল্লাহ্‌র নামের বীজ তার অন্তরে বপন করে দেবেন।

তিনি আরো বলেন, পরপারের কোন যাত্রীই একাকী এই দুর্গম পথ খুবই সহজভাবে অতিক্রম করতে পারেন না। কারণ এই অজানা অচেনা দুর্গম পথ অতিক্রম করা অন্ধের হাতী দেখার সমতুল্য। পথভ্রষ্ট মানজাতিকে পথ দেখাবার জন্য আল্লাহতালা যেমন নবী-রাসূলদেরকে বিশ্ব মানবকুলে পাঠিয়েছিলেন এবং সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর ওফাতের পর তাঁর মহান আহলে বাইত, তাঁদের পবিত্র বংশধর খলিফা, ভক্ত, অনুসারী বা তাদের নায়েব বা প্রতিনিধিগণই বিভ্রান্ত মানব জাতিকে সুপথ দেখিয়ে আসছেন। এই পথ দেখানোর মধ্যে দুইটি দিক নির্দেশিত হয়ে আসছে। একটি কোরআনের প্রকাশ্য নির্দেশ যা তথা শরীয়তের

দিক নির্দেশনা, অন্যটি অপ্রকাশ্য ত্বরিকতের রহস্য ভেদনির্দেশন। সুতরাং, একজন প্রকৃত পীর ছাড়া একজন খোদা অন্বেষী বা প্রেমিকের কোন গতি নেই।

মহান আল্লাহ্তালা আমাদের এ ধরণের ওলী-মুর্শেদের অনুসরণের তৌফিক দিন আমিন!